গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৩৬৯

প্রকাশিকা ঃ লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ অনিলকুমার ঘোষ। নিউ ঘোষ প্রেস। ৪/১ই, বিডন রো, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ বিমল দাস

গোলমাল

সকালবেলাটি বড় মনোরম। বড় সুন্দর। দোতলার ঘর থেকে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে হরিবাবুর মনটা খুব ভাল হয়ে গেল। বাগানে হাজার রকম গাছগাছালি। পাখিরা ডাকাডাকি করছে, শরৎকালের মোলায়েম সকালের ঠাণ্ডা রোদে চারদিক ভারী ফুটফুটে। উঠোনে রামরতন কাঠ কাটছে। বুড়ি ঝি বুধিয়া পশ্চিমের দেয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছে। টমি কুকুর একটা ফড়িঙের পিছনে ছোটাছুটি করছে। লকড়িঘরের চালে গম্ভীরভাবে বসে আছে বেড়াল ঝুমঝুমি। নীচের তলায় পড়ার ঘর থেকে হরিবাবুর ছেলে আর মেয়ের তারস্বরে পড়ার শব্দ আসছে। আর আসছে রান্নাঘর থেকে লুচি ভাজার গন্ধ। তিনি শুনেছেন, আজ সকালে জলখাবারে লুচির সঙ্গে ফুলকপির চচ্চড়িও থাকবে। হরিবাবু দাড়ি কামিয়েছেন, চা খেয়েছেন, লুচি খেয়ে বেড়াতে বেরোবেন। আজ ছুটির দিন।

ক'দিন ধরে হরিবাবুর মন ভাল নেই। তিনি ভাল রোজগার করেন। তাঁর কোনো রোগ নেই। সকলের সঙ্গেই তাঁর সদ্ভাব। কিন্তু তাঁর একটি গোপন শখ আছে। বাইরে তিনি যাই হোন, ভিতরে ভিতরে তিনি একজন কবি। তবে তাঁর কবিতা কোথাও ছাপা হয়নি তেমন। কিন্তু তাতে দমে না গিয়ে তিনি রোজ অনবরত লিখে চলেছেন কবিতার পর কবিতা। এযাবৎ গোটা কুড়ি মোটামোটা খাতা ভর্তি হয়ে গেছে। কিন্তু গত প্রায় পাঁচ সাতদিন বিস্তর ধস্তাধস্তি করেও এক লাইন কবিতাও তিনি লিখতে পারেননি। তাই মনটা বড় খারাপ।

আজ সকালের মনোরম দৃশ্য দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে কবিতার খাতা খুলে বসলেন। মনটা বেশ ফুরফুর করছে। বুকের ভিতরে কবিতার ভুরভুরি উঠছে। হাতটা নিশপিশ করছে। তিনি স্পষ্ট টের পাচ্ছেন, কবিতা আসছে। আসছে। তবে আর একটা কী যেন বাকি। আর একটা শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ বা দৃশ্য যোগ হলেই ভিতরে কবিতার ডিমটা ফেটে শিশু-কবিতা বেরিয়ে আসবে ডাক ছাড়তে ছাড়তে।

হরিবাবু উঠলেন। একটু অস্থিরভাবে অধীর পায়ে পায়চারি করতে লাগলেন দোতলার বারান্দায়। একটা টিয়া ডাক ছেড়ে আমগাছ থেকে উড়ে গেল। নীচের তলায় কোণের ঘর থেকে হরিবাবুর ভাই পরিবাবুর গলা সাধার তীব্র আওয়াজ আসছে। কিন্তু না, এসব নয়। আরও একটা যেন কিছুর দরকার। কী সেটা?

হরিবাবু হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। একটা ট্রেন যাচ্ছে। ঝিকির-ঝিকির ঝিকির-ঝিকির মিষ্টি শব্দে মাটি কাঁপিয়ে, বাতাসে ঢেউ তুলে গাছপালার আড়াল দিয়ে আপনমনে আপ ট্রেন চলে যাচ্ছে গন্তব্যে। বাঃ, চমৎকার। এই তো চাই। কবিতার ডিম ফেটে গেছে।

হরিবাবু দৌড়ে এসে টেবিলে বসে খাতা-কলম টেনে নিলেন। তারপর লিখলেন :

দ্যাখো ওই ভোরের প্রতিভা
ম্লান বিধবার মতো কুড়াতেছে শিউলির ফুল,
সূর্যের রক্তাক্ত বুকে দীর্ঘ ছুরিকার মতো ঢুকে যায় ট্রেন।

বান্টু নামে বাচ্চা চাকর এসে ডাকল, "বাবু, লুচি খাবেন যে! আসুন।"

হরিবাবু খুনির চোখে ছেলেটার দিকে চেয়ে বললেন, "এখন ডিস্টার্ব করলে লাশ ফেলে দেব! যাঃ।"

ছেলেটা হরিবাবুকে ভালই চেনে। হরিবাবু যে ভাল লোক তাতে সন্দেহ নেই, তবে কবিতা লেখার সময় লোকটা সাক্ষাৎ খুনে।

সুতরাং বান্টু মিনমিন করে "লুচি মে ঠান্ডা মেরে গেল" বলেই পালাল।

কিন্তু হরিবাবুর চিন্তার সূত্র সেই যে ছিন্ন হল, আর আধঘন্টার মধ্যে জোড়া লাগল না। চতুর্থ পঙ্‌ক্তিটা আর কিছুতেই মাথায় আসছে না। বহুবার উঠলেন, জল খেলেন, মাথা ঝাঁকালেন, একটু ব্যায়ামও করে নিলেন। কিন্তু নাঃ, এল না।

পরিবাবুর গান থামল। ছেলেমেয়ের পড়া থামল। পাখির ডাক থামল। কাঠ কাটার শব্দও আর হচ্ছে না। রোদ বেশ চড়ে গেল। হরিবাবুর পেট চুঁইচুঁই করতে লাগল। তবু এল না।

হরিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে খাতাটা বন্ধ করলেন। তারপর নীরবে খাওয়ার ঘরে এসে টেবিলে বসলেন।

তাঁর স্ত্রী সুনয়নী দেবী ঝংকার দিয়ে উঠলেন, "এত বেলায় আর জলখাবার খেয়ে কী হবে? যাও, চান করে এসে একেবারে ভাত খেতে বোসো। বেলা বারোটা বাজে।"

"বারোটা?" খুব অবাক হলেন হরিবাবু। দেয়ালঘড়িতে দেখলেন সত্যিই বারোটা বাজে। এক গ্লাস জল খেয়ে হরিবাবু উঠে পড়লেন। তারপর পিছনের বাগানে এসে গাছপালার মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন।

কিন্তু কোথাও শান্তি বা নির্জনতা নেই। বাগানের কোণের দিকে মাটি কুপিয়ে তাঁর সবচেয়ে ছোট ভাই ন্যাড়া একটা কুস্তির আখড়া বানিয়েছে। সেই-খানে তিন-চারজন এখন মহড়া দিচ্ছে। হুপহাপ গুপগাপ শব্দ। বিরক্ত হয়ে হরিবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

বেরোবার মুখেই দেখলেন বাড়ির সামনে একটা উটকো লোক দাঁড়িয়ে আছে। গালে কয়েকদিনের রুখু দাড়ি, পরনে একটা ময়লা পাজামা, গায়ে

তাপ্পি দেওয়া একটা ঢোলা জামা, কাঁধে একটা বেশ বড় পোঁটলা। রোগাভোগা কাহিল চেহারা। বয়স খুব বেশি নয়, ত্রিশের কাছাকাছি।

লোকটাকে দেখেই হরিবাবুর মনে পড়ল, ইদানীং খুব চোর-ছ্যাঁচোড়ের উৎপাত হয়েছে শহরে। এই লোকটার চেহারাটাও সন্দেহজনক। উঁকিঝুঁকিও মারছে। সুতরাং তিনি লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে ধমকের স্বরে বললেন, "এই, তুমি কে হে? কেয়া মাংতা? হুম ডু ইউ ওয়ান্ট?"

তিন-তিনটে ভাষায় ধমক খেয়ে লোকটা কেমন ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গিয়ে মিনমিন করে বলল, "আমি অনেক দূর থেকে আসছি।"

হরিবাবু খেঁকিয়ে উঠে বললেন, "তাহলে মাথা কিনে নিয়েছ আর কী। দূর থেকে আসছ তো কী? আসতে বলেছিল কে? না এলেই বা এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হত?"

লোকটা এসব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর খুঁজে না পেয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, "তা বটে, না এলেও হত।"

"তাহলে এবার কেটে পড়ো। যত দূর থেকে এসেছ, আবার তত দূরেই ফিরে যাও। নইলে পুলিশ ডাকব।"

লোকটা মাথা নাড়ল। অর্থাৎ সে বুঝেছে। কিছুক্ষণ ক্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে থেকে লোকটা খুব ভয়ে-ভয়ে বলল, "আজ্ঞে একটা কথা ছিল। সেটা জেনেই চলে যাব।"

"কী কথা? অ্যাঁ! তোমার মতো ভ্যাগাবন্ডের আবার কথা কিসের? যত সব গাঁজাখুরি দুঃখের কথা বানিয়ে-বানিয়ে বলবে, আর বাড়ির দিকে আড়ে-আড়ে চেয়ে কোথায় কী আছে নজর করবে তো? ওসব কায়দা আমি ঢের জানি।"

লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে বুঝদারের মতো মাথা নেড়ে বলল, "আজ্ঞে কথাটা ঠিকই বলেছেন। দিনকাল ভাল নয়। চারদিকে চোর-জোচ্চোর সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। উটকো লোককে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল। তবে আমার কথাটা খুবই ছোট। আমি শুধু জিজ্ঞেস করছিলাম এটাই শিবু হালদার মশাইয়ের বাড়ি কি না।"

"হলে কী করবে?"

"তাঁর বড় ছেলেকে একটা কথা বলে যাব আর একটা জিনিসও দিয়ে যাব।"

"কী কথা? কী জিনিস?"

"আজ্ঞে সে তো শিবু হালদার মশাইয়ের বড় ছেলে ছাড়া আর-কাউকে বলা যাবে না।"

হরিবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "আমিই শিবু হালদারের বড় ছেলে, আর এটাই শিবু হালদারের বাড়ি।"

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "আমিও এরকমই অনুমান করেছিলাম।"

হরিবাবু বললেন, "আর তোমার অনুমানে কাজ নেই। শিবু হালদারের

বাড়ি এ-শহরের সবাই চেনে। বেশি বোকা সেজো না। যা বলবার বলে ফেলো।"

লোকটা ভারী কাচুমাচু হয়ে বলে, "আজ্ঞে আমি একরকম তাঁর কাছ থেকেই আসছি।"

"একরকম! একরকম মানেটা কী হল হে? তাঁর কাছ থেকে আসছ মানেটাই বা কী? ইয়ার্কি মারার আর জায়গা পেলে না?"

লোকটা সবেগে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, "আপনি বড় ভড়কে দেন মানুষকে। অত ধমকালে কি বুদ্ধি ঠিক থাকে?"

"বুদ্ধি অনেক খেলিয়েছ, এবার পেটের কথাটি মুখে আনো তো বাছাধন। শিবু হালদারকে তুমি পেলে কোথায়? তিনি তো বছর বিশেক আগেই গত হয়েছেন।"

"আজ্ঞে তা হবে। তিনি যে আর ইহধামে নেই সে-কথা খবরের কাগজেই পড়েছিলাম। স্বনামধন্য লোক ছিলেন। বাঙালির মধ্যে অমন প্রতিভা খুব কম দেখা যায়।"

"তা কথাটা কী তা বলবে?"

"বলছি। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা প্রায় ত্রিশ বছর আগে। আপনি তখন এইটুকু।"

"বটে! তা তুমি তখন কতটুকু?"

"আমাকে দেখে বয়সের অনুমান পাবেন না।"

"তাই নাকি ব্যাটা হনুমান? ডাকব ন্যাড়াকে?"

"থাক থাক, লোক ডাকতে হবে না। আপনি একাই একশো। শিবু হালদার মশাই বলতেন বটে, ওরে পীতাম্বর, তুই দেখে নিস, আমার বড় ছেলে এই হরি একদিন কবি হবে। ওর হাত পা চোখ সব কবির মতো, তা দেখছি, শিবু হালদারের মতো বিচক্ষণ লোকেরও ভুল হয়। কবি কোথায়, এ তো দেখছি দারোগা।"

এ-কথায় হরিবাবুর এবার ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার পালা। খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললেন, "বাবা বলতেন ও-কথা?"

"তবে কি বানিয়ে বলছি?"

হরিবাবু ঢোক গিলে বললেন, "তুমি বাপু বড্ড ঘড়েল দেখছি। শিবু হালদারকে চিনতে, তার মানে তোমার বয়স তখন···"

লোকটা শশব্যস্তে বলল, "বেশি নয়, চল্লিশের মধ্যেই। এখন এই সত্তর চলছে।"

"সত্তর?"

"সামনের মাঘে একাত্তর পূর্ণ হবে।"

"মিথ্যে কথা!"

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কেউ বিশ্বাস করে না। তা সে

যাকগে। গত ত্রিশ বছর তাঁর একটা দায় কাঁধে নিয়ে ঘুরছি। সেই দায় থেকে মুক্ত হতে আসা।"

বলে লোকটা পাজামার কোমর থেকে একটা গেঁজে বার করে আনল। তারপর সেটা হরিবাবুর হাতে দিয়ে বলল, "ঈশান কোণ, তিন ক্রোশ।"

হরিবাবু অবাক হয়ে বললেন, "তার মানে?"

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "আর জানি না। শিবু হালদার মশাই এর বেশি আর বলেননি।"

দুই

উটকো লোকটার ওপর হরিবাবুর আর তেমন যেন রাগ হচ্ছিল না। তবু রাগের ভাবটা বজায় রেখে একটু চড়া গলায় বললেন, "আমাকে ধাঁধা দেখাচ্ছ? ভাবছ তোমার সব কথা বিশ্বাস করছি? ঈশান কোণ আর তিন ক্রোশ, এর কোনো মানে হয়?"

লোকটা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, "আরে চুপ চুপ। এসব অতিশয় গোপন কথা। শিবাবাবু পইপই করে বারণ করেছিলেন, পাঁচকান যেন না হয়। আমার কর্তব্যটুকু করে গেলাম, ঘাড় থেকে দায় নেমে গেল, এবার তাহলে যাই।"

"গেলেই হল? তোমার নাম বলো, ঠিকানা বলো, কী কাজটাজ করো একে-একে তাও বলো।"

লোকটা মাথা চুলকে খুব বিনীতভাবে বলল, "নাম তো মেলা। এক-এক জায়গায় এক-এক রকম। কোন্‌টা বলব?"

হরিবাবু ভড়কে গিয়ে বলেন, "অনেক রকম নাম কেন?"

"আজ্ঞে সে অনেক কথা, বললে আপনি রাগ করবেন।"

"আহা, যেন এখন আমি রেগে নেই। আমাকে আর রাগালে কিন্তু একদম রেগে যাব, তখন বুঝবে। আমার এক ভাই কুস্তিগির, এক ভাই পুলিশ, আমি—"

"আজ্ঞে আর বলতে হবে না। শিবুবাবু খুব গেরোতে ফেলেছেন বুঝতে পারছি। কথাটা কী জানেন, আমি তেমন ভাল লোক নই। যেখানেই যখনই থাকি, একটা-না-একটা অপকর্ম করে ফেলি। ঠিক আমিই যে করি তা বলা যায় না। তবে আমার হাত দুখানা করে ফেলে। তা সে একরকম আমারই করা হল।"

"বটে! বটে! তা অপকর্মগুলো কীরকম?"

কোথাও খুন, কোথাও ডাকাতি, কোথাও চুরি, এই নানারকম আর কী, পুলিশ পিছনে লাগে বলে নামধাম চেহারা সবই পাল্টাতে হয়। তা এই করতে-করতে নিজের নামটা একেবারে বিস্মরণ হয়ে গেল। কখনও মনে হয় চারুদত্ত, কখনও মনে হয় মেঘদূত, কখনও মনে হয় দ্বৈপায়ন। কিছুতেই স্থির করতে পারি না কোন্‌টা। তাই লোকে জিজ্ঞেস করলে যা হয় একটা বলে দিই। এই

যেমন এখন আপনি জিজ্ঞেস করার পর হঠাৎ মনে হল আমার নাম বোধহয় পঞ্চানন্দ। কোত্থেকে যে নামটা মাথায় এল, তাই বুঝতে পারছি না। এরকম নাম জন্মে শুনিনি।"

হরিবাবু খুব কটমট করে পঞ্চানন্দের দিকে তাকিয়ে রইলেন। লোকটার ওপর সত্যি-সত্যি রাগ করা উচিত কি না তা তিনি বুঝতে পারছেন না। তবে তাঁর তেমন রাগ হচ্ছে না। রাগ কখনও তাঁর তেমন হয় না। আর রাগ হয় না বলেই সংসারে তাঁর মতামতের দাম এত কম। সে যাকগে, হরিবাবু যথাসাধ্য রাগ-রাগ গলায় বললেন, "তুমি তাহলে একজন খুনি, গুণ্ডা এবং চোর। ঠিক তো?"

"আজ্ঞে খুব ঠিক। লোক আমি মোটেই সুবিধের নই।"

"কিন্তু তাহলে আমার বাবার সঙ্গে তোমার এত মাখামাখি হল কী করে?"

পঞ্চানন্দ জামাটা তুলে মুখটা তাই দিয়ে মুছে নিয়ে বলল, "লোক ভাল হলে কী হবে, শিবু হালদার মশাই ছিলেন মাথা-পাগলা লোক। ওই সায়েন্স-সায়েন্স করেই মাথাটা বিগড়োল। আমার চালচুলো ছিল না, এখনও অবিশ্যি নেই, তা আমি সারাদিন কুড়িয়ে-বাড়িয়ে-চেয়েচিন্তে চুরি-ডাকাতি করে খেতাম। রাত্তিরের দিকটায় ওই আপনাদের পুবদিককার দালানের বাইরের বারান্দায় চট পেতে শুয়ে থাকতাম।...তা বাবু, খুব পোলাও রাঁধার গন্ধ পাচ্ছি যে বাড়িতে কি ভোজ?"

"রোববারে ভালমন্দ হয় একটু।"

"হয়? বাঃ, বেশ। তা আপনারা ব্রাহ্মণভোজন করান না?"

"তুমি কি বাপু ব্রাহ্মণ?"

পঞ্চানন্দ একগাল হেসে বলল, "ছিলাম বোধহয়। অনেককালের কথা তো। কিন্তু মনে হয় ছিলাম যেন ব্রাহ্মণই। নিদেন দরিদ্রনারায়ণসেবাও তো করতে পারেন।"

স্পর্ধা দেখে হরিবাবু অবাক হন। লোকটা নির্লজ্জও বটে। তবে একেবারে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিতেও তাঁর বাধছে। লোকটা একটা পেতলের চাবি আর একটা সংকেত দিয়েছে। কোনো গুপ্তধনের হদিস কি না তা হরিবাবু জানেন না। গুলগপ্পোও হতে পারে। হরিবাবু খুব কটমট করে লোকটার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "ঠিক আছে, ব্রাহ্মণভোজন বা দরিদ্রনারায়ণসেবা যা হয় একটা হবে'খন। তবে সে সকলের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরে।"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলে, 'সে আর বলতে। সব বাড়িতেই এক ব্যবস্থা। আমারও হলেই হল।"

"হ্যাঁ, কি বলছিলে যেন?"

পঞ্চানন্দ মুখটা করুণ করে বলল, "আজ্ঞে সেই হিমালয় থেকে টানা হেঁটে আসছি। মানুষের শরীর তো। একটু বসে-টসে একটু হাঁফ ছাড়তে-ছাড়তে কথাটথা বললে হয় না? শিবুবাবুর ঘরখানা যদি ফাঁকা থাকে তো তার

দাওয়াতেই দিয়ে একটু বসি চলুন।"

হরিবাবু দোনোমনো করে বললেন, "ঘর ফাঁকাই আছে। বাবার ল্যাবরেটরিতে আমরা কেউ ঢুকি না। আমার ছেলে মাঝে-মাঝে খুটখাট করে গিয়ে। তা এসো।"

শিবু হালদারের ল্যাবরেটরি খুব একটা দেখনসই কিছুই নয়। বাড়ি থেকে কিছুটা তফাতে, খুব ঘন গাছপালা আর ঝোপঝাড়ে প্রায় ঢাকা, লম্বা একটা একতলা দালান। এদিকটা খুব নির্জন। ইদানীং সাপখোপের বাসা হয়েছে। ল্যাবরেটরিতে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি, শিশিবোতল, জার, রাসায়নিক এখনও আছে। কেউ হাত দেয়নি। বারান্দাটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সেই দাওয়ায় বসে পঞ্চানন্দ জামার ঝুল দিয়ে ফের মুখ মুছল। তারপর বলল, "পোলাওয়ের গন্ধটা খুব ছড়িয়েছে কিন্তু মশাই। তা বেগুনি-টেগুনিও হবে নাকি? চাটনি? মাংস তো বলতে নেই, হচ্ছেই। মাছও কি থাকছে সঙ্গে? দই খান না আপনারা? আগে এদিককার রসোমালাই খুব বিখ্যাত ছিল, আর ছানার গজা।"

হরিবাবু আবার রেগে যাওয়ার চেষ্টা করে বললেন, "এটা কি বিয়েবাড়ি নাকি? ওসব খাওয়ার গপ্পো এখন বন্ধ করো। কাজের কথা বলো দেখি।"

পঞ্চানন্দ বেশ জেঁকে বসল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে একটা আরামের শ্বাস ফেলে বলল, "এইখানটাতেই শুয়ে থাকতাম এসে। শিবুবাবু অনেক রাত অবধি ঘরের মধ্যে কী সব মারণ-উচাটন করতেন।"

হরিবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "মোটেই মারণ-উচাটন নয়। নানারকম এক্সপেরিমেণ্ট করতেন।"

"ওই হল। তা একদিন রাত্রিবেলা সবে চোখদুটো লেগেছে, তখন এসে আমাকে ঠেলে তুললেন, 'ওরে ওঠ ওঠ, দেখে যা কাণ্ডখানা।' তা চোখ কচলাতে কচলাতে গিয়ে ঢুকলাম শিবুবাবুর জাদুঘরে। বললে বিশ্বাস করবেন না যা দেখলাম তাতে চোখ ছানাবড়া।"

"কী দেখলে?"

"একখানা কাচের বাক্সে ব্যাঙের ছাতার মতো আকৃতির ধন ধোঁয়া আর সাদা আগুনের ঝলকানি। শিবুবাবু কী বললেন জানেন? বললেন, জাপানিরা নাকি বড়-বড় গাছের বেঁটে-বেঁটে চেহারা করতে পারে। তাকে বলে বানসাই।"

"জানি। এক বিঘত বটগাছ, ছ' আঙুল তেঁতুলগাছ তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তা শিবুবাবু সেইরকমই একখানা বানসাই অ্যাটম বোমা বানিয়েছেন। কাচের বাক্সের মধ্যে বিঘতখানেক উঁচু সেই কাণ্ডখানা হল সেই বানসাই অ্যাটম বোমার কাজ।"

"বলো কী?"

"সে তো শুধু একটা ঘটনা। বৃত্তান্ত আরও আছে।"

"আছে ? বলে ফেলো ?"

"শুনবেন ? আপনার খিদে পাচ্ছে না ?"

"খিদে ? না, এই তো লুচি খেলাম। ও হো, না না, আমি তো লুচি খাইনি। হ্যাঁ, খিদে তো পেয়েছে হে।"

পঞ্চানন্দ একগাল হেসে বলল, "ঠিক করতে পারছেন না তো ? শিবুবাবুও তাই বলতেন, আমার বড় ছেলেটা একেবারে অকালকুষ্মাণ্ড না হয়ে যায় না। তা না হয় হল, কিন্তু আবার কবিও না হয়ে বসে।"

একটু সংকুচিত হয়ে গিয়ে হরিবাবু বললেন, "কবিদের ওপর তাঁর খুব রাগ ছিল নাকি ?"

"রাগ ছিল না আবার ! কবি শুনলেই খেপে উঠতেন। অবশ্য খেপবারই কথা। বয়সকালে ঝুড়ি-ঝুড়ি কবিতা লিখে লিখে কাগজে পাঠাতেন, কেউ ছাপত না। হন্যে হয়ে উঠেছিলেন ছাপানোর জন্য। এমনকি, তিন-চারজন সম্পাদককে ধার পর্যন্ত দিয়েছিলেন। তবু ছাপা হয়নি। কবিদের ডেকে এনে খুব খাওয়াতেন, কবিদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, এক কবি তাঁর চেনসুদ্ধু সোনার ঘড়ি ধার নিয়ে আর ফেরত দিল না। আর এক কবি..."

তাঁর বাবা শিবু হালদারও কবিতা লিখতেন শুনে হরিবাবুর খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু হলেন না, ব্যাজার মুখে বললেন, "থাক, আর শুনতে চাই না।"

"সে না হয় না-চাইলেন, কিন্তু খিদের ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত এইবেলা করে নিন। লুচি খেয়েছেন কি খাননি, খিদে পেয়েছে কি পায়নি এসব বেশ ভাল করে ভেবেচিন্তে ঠিক করে নিন। লুচি যদি না খেয়ে থাকেন, তবে আর অবেলায় সেটা খেয়ে কাজ নেই। বরং ব্রাহ্মণভোজনে লাগিয়ে দিন। জিনিসটারও সদ্‌গতি হল, খানিক পুন্যিও পেয়ে গেলেন।"

"তুমি বড্ড বেশি বাচাল তো হে।"

"আজ্ঞে পেটটা ফাঁকা থাকলে আমার বড় কথা আসে। সে যাকগে, যা বলছিলাম। একদিন মাঝরাত্তিরে ল্যাবরেটরি-ঘরে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড শুনে ঘুম ভেঙে গেল। তড়াক করে উঠে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি তিনটে এই জোয়ান কালা সাহেব শিবুবাবুকে রাম-ধোলাই দিচ্ছে। দেখে আমি ভিরমি খাই আর কী, কিন্তু ভিরমি খেতে খেতেও দেখলাম শিবুবাবু তিনটে সাহেবকেই একে-একে নিকেশ করে ফেললেন।"

হরিবাবু কেঁপে উঠে বললেন, "বলো কী ?"

"তাও আলপিন দিয়ে।"

"অ্যাঁ ! আলপিন ?"

"তবে আর বলছি কী ? ঠিক আলপিন নয় বটে, তবে ও-রকমই সরু আর ছোট্ট পিস্তল ছিল তাঁর, মুখ থেকে সুতোর নালের মতো সূক্ষ্ম গুলি বেরোত। সাহেবরা তো অত কলকব্জা জানে না। শিবুবাবু তাদের খুন করে আমাকে

ডাকলেন। দু'জনে ধরাধরি করে তিন-তিনটে লাশকে ওই বাগানের পশ্চিমধারে পুঁতলাম। দেখছেন না ওখানে কেয়াগাছটার কেমন বাড়বাড়ন্ত। জৈব সার পেয়েছে কিনা।

তিন

হরিবাবু লোকটাকে বিশ্বাস করছেন না ঠিকই, কিন্তু কথাগুলো একেবারে উড়িয়েও দিতে পারছেন না। কেয়াঝোপটার দিকে তাকিয়ে একটু দুর্বল গলায় বললেন, "গুল মারার আর জায়গা পাওনি? আমার বাবাকে খুনি বলে বদনাম দিতে চাও?"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলে, "আজ্ঞে আত্মরক্ষার জন্য খুন করলে সেটাকে খুন বলে ধরা হয় না আইনেই আছে। শিবুবাবু তো নিজেকে বাঁচাতে খুন তিনটে করেছিলেন। এখনও ওই কেয়াঝোপের এলাকার মাটি খুঁড়লে তিনটে কঙ্কাল পাওয়া যাবে। শাবল-টাবল নেই বাড়িতে? দিন না, খুঁড়ে দেখাচ্ছি।"

হরিবাবু আঁতকে উঠে বললেন, "থাক্ থাক্, তার দরকার নেই।",

পঞ্চানন্দ তার খড়িওঠা গা চুলকোতে চুলকোতে বলল, "একটু চান-টান করা দরকার, বুঝলেন! খাঁটি সর্ষের তেল ছাড়া আমার আবার সহ্য হয় না। এক টুকবো গন্ধসাবান কি পাওয়া যাবে?"

রাগে হরিবাবু ভিতরে ভিতরে ফুঁসছিলেন। চোখ দিয়ে লোকটাকে প্রায় ভস্ম করে দিতে দিতে বললেন, "আর কী কী চাই তোমার বাপু?"

পঞ্চানন্দ মাথা চুলকে বলল, "আরও কিছু চাই বটে, কিন্তু ঠিক মনে পড়ছে না। তা ক্রমে ক্রমে বলব'খন। এখন একটু তেল আর সাবান হলেই হয়। আমার গরম জল লাগে না, গামছারও দরকার নেই আর ফুলেল তেল না হলেও চলবে।"

"বটে!"

লোকটা গালে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, "দাড়িটা বড্ড কুটকুট করছে তখন থেকে। আট গণ্ডা পয়সা পেলে সেলুনে গিয়ে কামিয়ে আসতাম। আর মাথার অবস্থাটাও দেখুন, চুল একেবারে কাকের বাসা। তা ধরুন আরও পাঁচসিকে হলে চুলটারও একটা গতি হয়।"

"ব্ল্যাকমেল করার ফিকিরে আছ তো? দেখাচ্ছি ব্ল্যাকমেল!"

"মেল? আজ্ঞে মেলট্রেনের কথা উঠছে কেন বলুন তো? আমার তো এখন কোথাও যাওয়ার কথা নেই? তবে ফিকিরের কথা যদি বলেন তো বলতে হয়, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি খুব ফিকিরের লোক। শিবুবাবু যখন আকাশী জামা বানালেন, তখন সেই জামা পরে আমিও তাঁর সঙ্গে আকাশে উঠে যেতুম। হেঃ হেঃ! খুব মজা হত মশাই। দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে আকাশে ঘুরে বেড়ানো। মেঘের রাজ্যে ঢুকে সে যে কী রগড়ই হত! তা তখন একদিন একটা ফিকির খেলল মাথায়। একদিন দুধ চিনি সব সঙ্গে নিয়ে গিয়ে

খানিকটা মেঘ মিশিয়ে দিব্যি আইসক্রিম বানিয়ে খেলুম দুজনায়। শিবুবাবুও বলতেন, পঞ্চানন্দ, তুই খুব ফিকিরের লোক।"

"আকাশী জামা?" হরিবাবুর চোখ একদম রসগোল্লার মতো গোল হয়ে গেল।

"তবে আর বলছি কী? শিবুবাবু পাগলা গোছের ছিলেন বটে, তবে বুদ্ধির একেবারে ঢেঁকি। ফটাফট আজগুবি সব জিনিস বানিয়ে ফেলতেন।"

"কই, আমি তো এইসব আবিষ্কারের কথা শুনিনি?"

"খুব গোপন রেখেছিলেন কিনা। সর্বদাই শত্রুপক্ষের চরেরা ঘুরঘুর করত যে। ওই তিনটে সাহেব খুন হল কি এমনি-এমনি? তারাও মতলব নিয়েই এসেছিল। আরও সব আসত। মিশমিশে কালো লোক, চাপ্টা নাক আর ছোট চোখ-অলা লোক, বাদামি রঙের ঢ্যাঙা চেহারার লোক, বেঁটে বক্কেশ্বর চেহারার লোক। তারা বড় ভাল লোকও ছিল না। একদল তো চিঠি দিয়েছিল, যদি আকাশী জামার গুপ্ত কথা আমোদের না জানান, তো আপনার ছেলে হরিকে চুরি করব।"

"বলো কী?"

"আজ্ঞে একেবারে নিয্যস সত্যি। চুরি করে নিয়ে মেরেই ফেলত বোধহয়। সেই ভয়ে শিবুবাবু শেষ দিকটায় সব লুকিয়ে-টুকিয়ে ফেললেন, জিনিসও আর তেমন বানাতেন না। তবু ওলন্দাজের হাতে প্রাণটা দিতে হল।"

"তার মানে? ওলন্দাজটা আবার কি "

"আচ্ছা মশাই, আপনাব কি খিদে-তেষ্টা নেই নাকি? আপনার না থাক, আমার আছে। যদি অসুবিধে থাকে তো বলুন, আমি না হয় অন্য জায়গায় যাই। তখন থেকে বকে-বকে মুখে ফেকো উঠে গেল।"

হরিবাবু একটু নরম গলায় বললেন, "আচ্ছা বাপু বোসো, তেল পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওই দিকে কলাঝাড়ের ওপাশে একটা কুয়ো আছে, চানটান করে নাও গে।"

খুবই চিন্তিতভাবে হরিবাবু ফিরে এলেন ঘরে। বাচ্চা চাকরটাকে ডেকে তেল দিয়ে আসতে বললেন। এক টুকরো সাবানও।

হরিবাবুর স্ত্রী এসে বললেন, "লাটসাহেবটি কে?"

"ইয়ে, বাবার বন্ধু।"

"শ্বশুরমশাইয়ের বন্ধু ওইটুকু একটা ছোঁড়া! তোমার মাথাটা গেছে;"

"ঠিক বন্ধু নয়, ওই সাকরেদ ছিল আর কী।"

"তুমি ঠিক জানো, নাকি মুখের কথা শুনে বিশ্বাস করলে?"

হরিবাবু বিজ্ঞের মতো হেসে বললেন, "খুব চিনি! ছেলেবেলায় কতবার দেখেছি।"

মিথ্যে কথাটা বলে একটু খারাপও লাগছিল হরিবাবুর। তবে না বললেও চলে না। এ বাড়ির কেউ হরিবাবুর বুদ্ধির ওপর ভরসা রাখে না। কিন্তু

হরিবাবু জানেন, মাঝেমধ্যে একটু-আধটু গণ্ডগোল পাকিয়ে ফেললেও তিনি বোকা লোক নন।

তাঁর স্ত্রী অবশ্য আর উচ্চবাচ্য করলেন না। আপনমনে হরিবাবুর নির্বুদ্ধিতার নানা উদাহরণ দিতে দিতে রান্নাঘরে চলে গেলেন। হরিবাবু রোদে বসে তেল মাখতে মাখতে হাঁ করে আকাশের দিকে চেয়ে আকাশী জামার কথা ভাবতে লাগলেন। আকাশী জামা হাতে পেলে তাঁর ভারী উপকার হত। পৃথিবীর এইসব গণ্ডগোল এড়িয়ে দিব্যি মেঘের ওপরে গিয়ে বসে কবিতার পর কবিতা লিখে যেতেন।

ভাবতে ভাবতে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে, তেল-মাখা অবস্থাতেই বসে রইলেন। স্নান-খাওয়ার কথা আর মনেই রইল না। মেঘের বিছানায় বসে, মেঘের বালিশে ঠেস দিয়ে কবিতা লিখতে যে কী ভালই না লাগবে! মাঝে-মাঝে মেঘ থেকে আইসক্রিম বানিয়ে খেয়ে নেবেন। তবে তাঁর ভারী সর্দির ধাত, আইসক্রিম সহ্য হবে কি?

কতক্ষণ এইভাবে বসে থাকতেন তা বলা শক্ত। হঠাৎ একটা জোরালো গলা-খাকারির শব্দে সচেতন হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, বেশ তেল-চুকচুকে চেহারা নিয়ে পঞ্চানন দাঁড়িয়ে আছে। গাল-টাল কামানো, ফিটফাট। অমায়িক হেসে বলল, "আজ্ঞে, স্নানের পর খাওয়ারও একটা নিয়ম আছে। তা কবিদের বেলায় কি কোনো নিয়মই খাটে না?"

"কেন, নিয়ম খাটবে না কেন?"

"আপনারা সাধারণ মানুষ নন জানি, কিন্তু খিদে তো পাওয়ার কথা। আমাদের গাঁয়ে ভজহরি কবিয়ালকেও দেখেছি, ঝুরিঝুরি কবিতা লিখে ফেলত লহমায়। তারও কাছাকোছার ঠিক থাকত না, এ-পথে যেতে ও-পথে চলে যেত, রামকে শ্যাম বলে ভুল করত, ঘোর অমাবস্যায় পূর্ণিমার পদ্য লিখে ফেলত, কিন্তু খিদে পেলে সে একেবারে বক-রাক্ষস। হালুম-খালুম বলে লেগে যেত খাওয়ায়। আপনি যে দেখছি তার চেয়েও ঢের এগিয়ে গেছেন।"

"অ! হ্যাঁ, খাওয়ার একটা ব্যাপার আছে বটে। খিদেও পেয়েছে। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না পেটে এ-রকম একটা খুটখাট হচ্ছে কেন।"

"কী রকম বলুন তো! রাতের বেলায় ইঁদুর যেমন খুটখাট করে বেড়ায় সে-রকম তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেকটা সে-রকম।"

"তা হলে বলতে নেই আপনার খিদেই পেয়েছে। এবার গা তুলে ফেলুন, নইলে গিন্নিমা আমাদের ব্যবস্থাও করবেন না কিনা। আমারও পেটে ইঁদুরের দৌড়োদৌড়ি লেগে গেছে।"

হরিবাবু খুবই অন্যমনস্কভাবে স্নান-খাওয়া সেরে নিলেন।

দুপুরবেলায় বিছানায় আধশোয়া হয়ে পিতলের চাবিটা খুব নিবিষ্টমনে দেখলেন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। তাঁর সন্দেহ হতে লাগল, বাবা তাঁর আবিষ্কার-

করা জিনিসগুলো কোথাও লুকিয়ে রেখে গেছেন। ঈশান কোণে তিন ক্রোশ দূরে কোথাও। সেখানে এই পিতলের চাবি দিয়ে গুপ্ত দরজা খুলে ফেলতে পারলেই কেল্লা ফতে।

হরিবাবু যখন এইসব ভাবছেন তখন অন্যদিকে পঞ্চানন দুপুরের খাওয়া সেরে বাড়ির চাকরের সঙ্গে গল্প জুড়েছে। চাকর কুয়োতলায় বাসন মাজছিল। পঞ্চানন্দ সেখানে গিয়ে ঘাসের ওপর জেঁকে বসে বলল, "ওফ, কত পাল্টে গেছে সব।"

চাকরটা বলল, "তা আর বলতে! আগে জলখাবারের জন্য পাঁচখানা রুটি বরাদ্দ ছিল, এখন চারখানা। আগে চিনির চা দিত, আজকাল গুড়ের। আর জিনিসপত্রের দাম দ্বিগুণ বাড়লেও বেতন সেই পুরনো রেটে। ওটাই কেবল পাল্টায়নি।"

পঞ্চানন্দ কথাটা কানে না-তুলে বলল, "ত্রিশ বছর আগে যা দেখে গিয়েছিলুম তা আর কিছু নেই। তবে ভূত তিনটে নিশ্চয়ই আছে, না রে?"

"ভূত! তা থাকতে পারে।"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলে, "আহা, অত হালকাভাবে নিচ্ছিস কেন? যে-কোনো ভূতের কথা বলছি না। এ হল তিনটে সাহেব-ভূত। তখন তো খুব দাপাদাপি করে বেড়াত।"

চাকব কাজ থামিয়ে হাঁ করে চেয়ে থেকে বলল, "সাহেব-ভূত! এ-বাড়িতে ছিল নাকি?"

"থাকবে না মানে! যাবে কোথায়? ওই কেয়াঝোপের নীচে মাটির তলায় তাদের লাশ চাপা আছে না?"

"সত্যি বলছ?"

"মিথ্যে বলার কি জো আছে রে? নিজের হাতে পুঁতেছি তাদের। ওই পোঁতার পর থেকেই তাদের এখানে-সেখানে রাত-বিরেতে দেখা যায়। দেখিসনি?"

"আমি মোটে দু'মাস হল এসেছি। এখনও দেখিনি।"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলে, "মাঝে-মাঝে দেখা যায় না বটে। বিশেষ করে এই সময়টায় ওরা নিজেদের দেশে বেড়াতে যায়। ফিরে এসেই আবার লাগাবে'খন কুরুক্ষেত্র।"

"তিনটে সাহেব খুন হল কী করে?"

পঞ্চানন্দ গলা নামিয়ে বলল, "সে অনেক গোপন কথা।"

চাকরটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, "সাহেব-ভূতের কথা জানি না, তবে এ-বাড়িতে একটা পাহাড়ি ভূত আছে। বেঁটেখাটো মজবুত চেহারা।"

"বলিস কী?"

"কোমরে আই বড় ছোরা। দেখবে'খন, যদি থাকো। ওই যে বুড়োকর্তার

জাদুইঘর, ওর দাওয়ায় রাত-বিরেতে বসে থাকে এসে।"

কথাটা শুনে পঞ্চানন্দ হঠাৎ যেন কেমন ফ্যাকাসে মেরে গেল।

চার

ন্যাড়া কুস্তিগির বটে, তবে খুব যে সাহসী এমন নয়। কেঁদো কেঁদো চেহারার তার কয়েকজন কুস্তিগির বন্ধু আছে। পিছনের বাগানের একধারে মাটি কুপিয়ে কয়েক টিন তেল ঢেলে মাটি নরম করে হুশহাশ শব্দে তারা সেখানে কুস্তি লড়ে। সকলেরই মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। সেইজন্য তাদের বলা হয় ন্যাড়ার দল। সপ্তাহে একদিন গজ পালোয়ান এসে কুস্তির নানারকম কূট-কৌশল তাদের শেখায়। গজ পালোয়ান ঠিক পেশাদার কুস্তিগির নয়। একটু সাধু-সাধু ভাব আছে। কৌপীন পরে এবং সারা বছর শীতে গ্রীষ্মে আদুর গায়ে থাকে। ইদানীং মাথায় একটু জট দেখা দিয়েছে। স্বাস্থ্য এমন কিছু সাংঘাতিক নয়। লম্বা ছিপছিপে গড়ন। বয়সও তেমন বেশি বলে মনে হয় না। তবে মুখে কালো দাঁড়িগোঁফের জঙ্গল থাকায় বয়স অনুমান করা শক্ত। বছর-দেড়েক আগে শহরের পূর্ব প্রান্তে চক সাহেবের পোড়ো বাংলো বাড়ির উল্টোদিকে রাস্তার ধারে গজ পালোয়ানকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তখনও পরনে কৌপীন, পায়ে খড়ম। অচেনা লোককে ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে লোকে ধরাধরি করে এনে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। সুস্থ হয়ে ওঠার পর পুলিশ তাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও পেটের কথা বের করতে পারেনি। গজ পালোয়ান কোথা থেকে এসেছে, কে তাকে ছোরা মারল, এসব এখনও রহস্যাবৃত। তবে সেই থেকে গজ পালোয়ান এই শহরেই রয়ে গেছে। চক সাহেবের বাগানবাড়িতেই তার আস্তানা। সাধু গোছের রহস্যময় লোককে দেখলেই বহু মানুষের ভক্তিভাব দেখা দেয়। গজের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। লোকে অযাচিত হয়ে এসে চালটা ডালটা দিয়ে যায়, প্রণামীও পাওয়া যায় কিছু। সম্ভবত তাইতেই গজ পালোয়ানের চলে যায়।

গজ পালোয়ানের আস্তানায় ক্রমে ছেলে-ছোকরারাও জুটতে শুরু করল। গজ তাদের কাউকে কুস্তি শেখায়, কাউকে লগা বা ছোরা খেলা শেখায়, কাউকে শেখায় ম্যাজিক। যার যেরকম ধাত। ফলে শহরের ছেলে-ছোকরাদের এখন সময় কাটে মন্দ নয়। গজকে গুরুদক্ষিণা হিসেবে তারাও কিছু-কিছু দেয়। ন্যাড়া গজ পালোয়ানের অন্ধ ভক্ত।

ডন বৈঠক, নানারকম ব্যায়াম আর আসন এবং সেই সঙ্গে কুস্তি লড়ে ন্যাড়ার চেহারাটাও হয়েছে পেল্লায়। সারা গায়ে থানা থানা মাংস কে যেন ঘুঁটের মতো চাপড়ে দিয়েছে। কাউকে চেপে ধরলে দম বন্ধ হবে নির্ঘাত। কিন্তু পালোয়ান ন্যাড়াকে বীর বলা যাবে কি-না সন্দেহ। বাড়িতে চোর এলে ন্যাড়ার নাকের ডাক তেজালো হয়ে ওঠে। পাড়ায় মারপিট লাগলে ন্যাড়া মাথাধরার নাম করে বিছানা নেয়।

আজ ছুটির দিন ন্যাড়া সারা সকাল খুব কুস্তি লড়েছে। দুপুরে সেরটাক মাংস, ছ-টুকরো মাছ, আধসের পোলাও সাবড়ে উঠে বেশ তৃপ্ত বোধ করে নিজের ঘরে বসে আয়নায় ল্যাটিসমাসের খেলা দেখছিল। হ্যাঁ, তার ল্যাটিসমাস বেশ ভালই। হাত দুখানা তার মুগুরের মতোই মজবুত। একখানা পাথরের চাইয়ের মতো বুক। আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে দেখতে ন্যাড়া একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। এত মুগ্ধ যে, ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে যখন একটা লোক নিঃশব্দে ঢুকল তখন সে টেরও পেল না।

লোকটা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ন্যাড়ার মাস্‌লের খেলা দেখে আপন-মনেই বলে উঠল, "উরে বাস রে, এ যে দেখছি সাতটা বাঘে খেয়ে শেষ করতে পারবে না।"

এমন চমকানো ন্যাড়া বহুকাল চমকায়নি। বুকের ভিতর প্রথমেই তার হৃৎপিন্ডটা একটা ব্যাঙের মতো লাফ মারল। তারপর একটা লাফের পর ব্যাং যেমন অনেকক্ষণ থেমে থাকে তেমনি থেমে রইল। ন্যাড়ার ঘাড় শক্ত হয়ে গেল, হাত পা অসাড় হয়ে গেল, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল বরফের মতো। গলা দিয়ে দুর্বোধ একটা শব্দ বেরিয়ে এল, 'ঘোঁক! ঘোঁক!'

লোকটা ন্যাড়ার জলে-পড়া মুখচোখ আয়নার ভিতর দিয়ে দেখতে লাগল। তারপর একগাল হেসে বলল, "দিব্যি খেলিয়ে তুলেছেন তো শরীরখানা। একেবারে কোপানো খেত, এখানে-সেখানে চাপড়া উল্টে আছে। আহা, এই গন্ধমাদন দেখলে শিবুবাবু বড় খুশি হতেন।"

ন্যাড়া পলকহীন চোখে আয়নার ভিতর দিয়ে লোকটাকে দেখছিল। আসলে সে দেখতে চাইছিল না। কিন্তু চোখ বুজে ফেলার চেষ্টা করে সে টের পেল, চোখের পাতাও অবশ হয়ে গেছে। তাই বাধ্য হয়েই সে চেয়েছিল। এরকম ফটফটে দিনের বেলায় ভূত-প্রেত বা চোর-ডাকাতদের হানা দেওয়ার কথা নয়। কিন্তু দিনকাল যা পড়েছে তাতে ভরসারও তো কিছু নেই। এই যে দিব্যি দুপুরবেলা আস্ত একখানা উটকো ভূত তার ঘরে নেমে এসেছে এরই বা কী করা যাবে?

ভূত নাকি খোনা সুরে কথা বলে। কিন্তু এখন ভয়ের চোটে ন্যাড়ার গলা থেকেই খোনা স্বর বেরিয়ে এল, "আঁমার যেঁ বড়ঁ শীত কঁরছেঁ! আঁমি যেঁ কেঁমন ভঁয়-ভঁয় পাঁচ্ছি। ওঁরে বাঁবাঁ রেঁ!"

লোকটা শশব্যস্তে এগিয়ে এসে ন্যাড়ার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "এঃ, খোকাবাবু, ঠিক সেই ছোট্টবেলাটির মতোই ভয় পাও দেখছি। এঃ মা, দ্বৈপায়নকে ভয় কি খোকা? তোমাকে পিঠে নিয়ে কত ঘুরেছি, মনে নেই? সেই যে যখন এইটুকুন ছিলে, ঝুমঝুমি বাজাতে, মনে নেই?"

ন্যাড়ার ঘাড় একটু নরম হল। সে লোকটার দিকে হতভম্বের মতো চেয়ে বলল, "আপনি কে?"

লোকটা মাথা চুলকে বলে, "এই তো মুশকিলে ফেললে! লোকে যখন

জিজ্ঞেস করে 'আপনি কে', তখনই আমি সবচেয়ে বিপদে পড়ে যাই। আমি লোকটা যে আসলে কে তা আজকাল আমি নিজেই ঠাহর করতে পারি না। তবে শিবুবাবু আমাকে খুব চিনতেন।"

ন্যাড়া বড় একটা শ্বাস ফেলে বলল, 'আপনি আমার পিলে চমকে দিয়েছেন।'

লোকটা মাথা চুলকে একটু লজ্জার হাসি হেসে বলল, "তা চমকানো জিনিসটা ভাল। মাঝে-মাঝে চমকালে মানুষের বাড় খুব তাড়াতাড়ি হয়। গাঁয়ের দেশে দেখবে পুকুরে বেড়াজাল ফেলে মাছ ধরা হয়, তারপর ফের সেগুলোকে জলে ফেলে দেওয়া হয়। ওই যে ধরা হয় তাতে মাছ খুব চমকে গিয়ে তাড়াতাড়ি বেড়ে গিয়ে পেল্লায় সাইজের হয়ে দাঁড়ায়।"

ন্যাড়া নিশ্চিন্ত হয়ে তার ডানহাতের বাইসেপটা বাঁ হাত দিয়ে একটু পরীক্ষা করে নিয়ে বলে, "ঠিক কথা তো?"

"আজ্ঞে চারুদত্তর কথা মিথ্যে হয় খুব কম।"

"চারুদত্ত! সে আবার কে?"

"কেন, আমি! নামটা ভাল নয়?"

"এই যে বললেন আপনার নাম দ্বৈপায়ন!"

"বলেছি? বুড়ো বয়সে মাথাটাই গেছে। আমার ঠাকুরদাও মাথার দোষ ছিল। রাস্তায় বেরিয়ে যাকে-তাকে কামড়াতেন। সেই দোষটাই বর্তেছে আমার ওপর। না না, ভয় পেয়ো না খোকা। তোমাকে আমি কামড়াব না। আমার নাম দ্বৈপায়নও বটে, চারুদত্তও বটে। আরও কয়েকটা আছে, সব মনে পড়বে ধীরে ধীরে। তা, বলছিলাম কি, শিবুবাবুর যে ছেলে পুলিশে চাকরি করে, সে কোথায়?"

"সেজদা! সেজদা তো সেই কুমড়োডাঙায়।"

"অনেকটা দূর নাকি?"

"হাঁ, যেতে দেড় দিন লাগে। চারটে খাল পেরোতে হয়।"

"বাঃ বাঃ। খবরটা ভাল। তা খোকা, তোমাদের বন্দুক-টন্দুক নেই? শিবুবাবুর আমলে কিন্তু ছিল।"

"আছে, কিন্তু ব্যবহার হয় না।"

"খুব ভাল, খুব ভাল। বন্দুক বড় ভাল জিনিসও নয়। ওসব বিদেয় করে দেওয়াই ভাল। তা তুমিই বুঝি কুস্তিগির?"

"হ্যাঁ।"

"বাঃ বেশ। এরকমই চাই। তা সময়মতো দু'একটা প্যাঁচ-ট্যাচ শিখিয়ে দেব'খন।"

"আমি গজ পালোয়ানের কাছে শিখি।"

"গজ পালোয়ান! সে আবার কে?"

"ওই যে চক সাহেবের বাড়িতে যার আখড়া।"

কথাটা শুনে লোকটার মুখটা একটু কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেল।

পাঁচ

ন্যাড়াকে আর বিশেষ ঘাটাঘাটি করল না পঞ্চানন্দ। কয়েক মিনিটেই সে বুঝে নিয়েছে ন্যাড়া কীরকম লোক। তাই সে বলল, "তা বেশ ছোটবাবু, কুস্তিটুস্তি খুব ভালো জিনিস। তুমি বরং বসে বসে তোমার মাসল-টাসল দ্যাখো।' পঞ্চানন্দ বেরিয়ে এসে বাড়িটার এদিক-সেদিক সতর্ক পায়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বলতে নেই বাড়িটা বেশ বড়ই। একতলা দোতলা মিলিয়ে অনেকগুলো ঘর। বড় বড় বারান্দা। চাকর-বাকরদের থাকার জন্য বাড়ির হাতার মধ্যেই আলাদা ঘর আছে। দেখেশুনে পঞ্চানন্দ খুশীই হল। ঘরদোরের চেকনাই দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এদের বেশ পয়সাকড়ি আছে। এরকমটাই আশা করেছিল সে।

ঘুরতে ঘুরতে একতলার একখানা ঘরে ঢুকে পড়ল পঞ্চানন্দ। সেই ঘরে ওস্তাদ খৈয়াম খাঁয়ের ছবির সামনে জরিবাবু ধ্যান করছিলেন তখন। বিকেলের রেওয়াজ শুরু করার আগে গুরুর ছবির সামনে একটু ধ্যান তিনি রোজই করেন। তারপর তানপুরাটাকে প্রণাম করে তুলে নেন। শুরু হয় সুরের খেলা।

খৈয়াম খাঁ লখনউতে থাকেন। রগচটা বুড়ো মানুষ। বিশেষ কাউকে পাত্তা দেন না। যে-সব শিষ্যকে গানবাজনা শেখান, তারা তাঁকে যমের মতো ডরায়, আবার ভক্তিও করে। তাঁর চেহারাটা দেখবার মতো। বিশাল যমদূতের মতো পাকানো গোঁফ, মাথায় মস্ত পাগড়ি, গায়ে গলাবন্ধ কোট। চেহারাটা রোগাটে হলেও বেশ শক্তপোক্ত। চোখ দুখানা ভীষণ রাগী-রাগী। তার ফোটোর চোখের দিকে তাকালেও একটু ভয়-ভয় করে। শোনা যায় একসময় খৈয়াম খাঁ ডাকাতি করে বেড়াতেন। মানুষ-টানুষ মেরেছেনও মেলা। একবার পুলিশের তাড়া খেয়ে এক বাড়ির দোতলা থেকে লাফ মারতে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙে যায়। ভাঙা ঠ্যাং নিয়েই পালিয়ে যান অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলে। তারপর মাশ-চারেক পায়ে প্লাস্টার বেঁধে ঘরে শয্যাশায়ী ছিলেন। তখন সময় কাটানোর জন্য গান ধরেন এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই গায়ক হয়ে ওঠেন। খৈয়াম খাঁ এতই উঁচুদরের ওস্তাদ যে, সুর দিয়ে তিনি প্রায় যা-খুশি তা-ই করতে পারেন বলে একটা কিংবদন্তী আছে। শক্তি আছে বলে বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করেন, তার নাকি সাক্ষাৎ প্রমাণ খৈয়াম খাঁয়ের গান। একদিন নাকি খৈয়াম খাঁ সকালবেলায় তাঁর বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে পোষা পায়রা ওড়াচ্ছিলেন। সেই সময়ে একটা বাজপাখি তাঁর একটা পায়রাকে তাড়া করে। খৈয়াম খাঁ শুধু একটা তান ছুঁড়ে দিলেন আকাশে। সেই শব্দে বাজপাখিটা কাটা ঘুড়ির মতো লাট খেতে খেতে পড়ে গেল। আর একবার একটা বন্ধ দরজার তালা খোলা যাচ্ছিল না। খৈয়াম খাঁ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শুধু গুনগুন করে ভাঁজলেন। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে তালা কড়াত করে খুলে গেল। এমনও শোনা যায়, খৈয়াম খাঁর রেওয়াজের সময় নাকি রাজ্যের ভূত-প্রেত এসে চারদিকে

ঘিরে বসে হাঁ করে গান শোনে। তাদের দেখা যায় না বটে, কিন্তু গায়ের বোঁটকা গন্ধ পাওয়া যায়।

এহেন খৈয়াম খাঁর শিষ্য বলেই জরিবাবুরও গানের ওপর অগাধ বিশ্বাস। তিনি জানেন ঠিকমতো ঠিক জায়গায় ঠিক সুর লাগাতে পারলে যে-কোনও অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। প্রায় সময়েই তিনি একটা নেবানো মোমবাতি সামনে নিয়ে বসে রেওয়াজ করেন। কোনওদিন সুরের আগুনে মোমটা দপ করে জ্বলে উঠবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। গান গেয়ে তিনি জানালার কাচের শার্সি ফাটিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করেছেন। জরিবাবু জানেন এই বাড়িতে ভূত আছে। তিনি না দেখলেও ঝি-চাকরেরা বহুবার দেখেছে। গান গাওয়ার সময় প্রায়ই তিনি অনুভব করার চেষ্টা করেন ভূতেরা গান শুনতে এসেছে কি না। আজও তেমন তেমন কিছু স্পষ্টভাবে অনুভব করেননি। হয়তো এ-বাড়ির ভূতদের গানে তেমন আগ্রহ নেই। তবে আগ্রহ তিনি জাগিয়ে তুলবেনই। নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা চালিয়ে গেলে যে মোমবাতিও জ্বলবে, শার্সিও ফাটবে এবং ভূতও আসবে, এই বিশ্বাস তাঁর আছে।

আজ গুরুর ছবির সামনে ধ্যান করতে করতে জরিবাবু যেন স্পষ্টই খৈয়াম খাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন। এরকম মাঝে-মাঝে পান। ধ্যানে কথাবার্তাও হয় তাঁদের। আজ জরিবাবু ধ্যানে দেখলেন খৈয়াম খাঁ বিকেলে তাঁর বাড়ির সামনের বাগানে পায়চারি করছেন। করতে করতে একটা গোলাপ গাছের সামনে দাঁড়ালেন। গাছটায় অনেক কুঁড়ি হয়েছে, তবে একটাও ফোটা ফুল নেই। খৈয়াম খাঁ গাছটার সামনে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজলেন। অমনি ফটাফট কুঁড়িগুলো ফুটে মস্ত মস্ত গোলাপফুল হয়ে হাসতে লাগল। খৈয়াম খাঁ জরিবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "সুর মে রগড়ো, সুর মে মরো। বুঝলি ব্যাটা, সুরের পিছনে অসুরের মতো লেগে থাকতে হয়। সুরই সিঁড়ি, সুরই সড়ক, সুরই সম্পদ। বুঝলি?"

"জি হাঁ, খাঁ সাহেব।"

"রেওয়াজ করতে করতে গলা দিয়ে রক্ত উঠবে, তবু ছাড়বি না। মাথা ঘুরে পড়ে যাবি, ভিরমি খাবি, খিদে পাবে, তবু রেওয়াজ ছেড়ে উঠবি না। আমি একসময়ে দিনে আঠারো ঘণ্টা রেওয়াজ করেছি জানিস?"

"জানি খাঁ সাহেব।"

"তবে শুরু করে দে। সুরের ফুল ফুটিয়ে দিয়ে যা দুনিয়ায়। গান গাইবি এমন যে, মড়ার দেহে পর্যন্ত প্রাণসঞ্চার হয়ে যাবে।"

ভক্তিভরে গুরুদেবকে প্রণাম করে জরিবাবু ধ্যান শেষ করে তানপুরাটা তুলে নিলেন। তারপর পুরবীতে ধরলেন তান। আজ গলায় যেন আলাদা মেজাজ লেগেছে। খুব সুর খেলছে।

চোখ বুজে গাইতে গাইতে হঠাৎ তাঁর গায়ে কাঁটা দিল। কেমন যেন শিরশির করতে লাগল ঘাড়ের কাছটা। তিনি একটা গন্ধ পাচ্ছেন। চেনা

গন্ধ নয়। অচেনা গন্ধ। ঠিক বোঁটকা গন্ধ বলা যায় না বটে, কিন্তু বোঁটকা কথাটাও তো গোলমেলে। বোঁটকা বলতে ঠিক কোন গন্ধটাকে বোঝায়, তাই বা ক'জন বলতে পারে। তার ওপর সব ভূতের গায়ে কি আর একরকমের বোঁটকা গন্ধ হবে? হেরফের হবে না?

গাইতেগাইতেই বড় করে একটা শ্বাস নিলেন। না, কোনও ভুল নেই। একটা অদ্ভুত গন্ধ। সন্দেহ নেই, গানের টানে অদৃশ্যের জগৎ থেকে কেউ একজন এসেছে। একজন? না একাধিক?

চোখ খুলতে ঠিক সাহস হল না জরিবাবুর। মানুষটা তিনি খুব সাহসীও নন। ভূতপ্রেতকে ভয় পান। ভূতেরা তাঁর গান শুনুক এটা তিনি চান বটে, কিন্তু তারা একেবারে চোখের সামনে এসে হাজির হোক এটা তাঁর মোটেই পছন্দ নয়। ভূত ভূতের মতোই থাকবে, আড়ালে-আবডালে। চক্ষুলজ্জা বজায় রেখে।

খুব সাবধানে জরিবাবু তান ছাড়তে ছাড়তে বাঁ চোখ বন্ধ রেখে ডান চোখটা সিকিভাগ ফাঁক করলেন। ঘরের মধ্যে সন্ধের অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে উঠেছে। শব্দসাধনা করার জন্য ঘরের জানালা সব কটকটে আঁটা বলে আরও অন্ধকার লাগছে। জরিবাবু তান ছাড়তে ছাড়তে কোনাচে দৃষ্টিতে চারদিকটা দেখার চেষ্টা করলেন। প্রথমটায় কিছু দেখতে পেলেন না। তারপর হঠাৎ চোখে পড়ল দরজার দিকে একটা আবছায়া মূর্তি।

জরিবাবুর গলায় পূরবীতে হঠাৎ কাঁপন লাগল।

সে এমন কাঁপন যে, সুরটা পূরবী ছেড়ে হঠাৎ বেসুরো হয়ে তারসপ্তকে চড়ে বসল। কিছুতেই সেখান থেকে নামে না। জরিবাবুর হাত কাঁপতে লাগল, পা কাঁপতে লাগল, গলা কাঁপতে লাগল। এবং তারপর তিনি টের পেলেন গলা দিয়ে সুর নয়, কেবল "ভূ...ভূ...ভূ" শব্দ বেরিয়ে আসছে।

ভূতটা হঠাৎ নড়ে উঠল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, "না গো মশাই, হচ্ছে না। গলায় জোয়ারি ছিল ভালই, কিন্তু সুরটা কেটে গেল।"

জরিবাবুর অবশ হাত থেকে তানপুরাটা ঝনাত করে পড়ে গেল। কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, "আর হবে না।'

"কী হবে না?"

"আর কখনও গাইব না।"

"সে কী! গাইবেন না কেন? গান তো ভাল জিনিস। মন ভাল থাকে, ফুসফুস ভাল থাকে, গলার ব্যায়াম হয়। গাইবেন না কেন। খুব গাইবেন। আমাদের গাঁয়ের করালী ওস্তাদ এমন গান গাইত যে, আশেপাশের সাতটা গাঁয়ে কখনও চোর আসত না। গান ভারী উপকারী জিনিস।"

জরিবাবু কেমন যেন ক্যাবলার মতো খানিক লোকটার দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর মনে হতে লাগল, এই ভূতটা যথার্থ ভূত নাও হতে পারে। হয়তো চোর।

চোরকেও জরিবাবু যথেষ্ট ভয় পান। গলা-খাঁকারি দিয়ে তিনি একটু

ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করে বললেন, "আপনি কোনটা ?"

"আজ্ঞে, তার মানে ?"

"মানে ইয়ে, আপনি ভূত না চোর ?"

পঞ্চানন্দ এই কথায় দাঁত বের করে খুব একচোট হাসল। তারপর ঘাড়টাড় চুলকে ভারী লজ্জার ভাব দেখিয়ে বলল, "আজ্ঞে বোধহয় দুটোই।"

"তার মানে ?"

"আজ্ঞে ভূতেরা কি কেউ কখনও চোর ছিল না ? নাকি চোরেরাই কেউ কখনও মরে ভূত হয় না ?"

"ছিল। হয়।"

"তাহলে ? আমি ভূতও বটি, চোরও বটি।"

"দুটোই ?"

পঞ্চানন্দ ঘাড় হেলিয়ে নির্বিকার মুখে বলল, "দুটোই। তবু বলি মশাই, সন্দেহও একটু আছে। বছর-কুড়ি আগে ত্রিশূল পর্বত থেকে নামবার সময় বরফের উপর দিয়ে পিছলে তিন হাজার ফুট গভীর এক খাদে পড়ে গিয়েছিলাম। আমারই দোষ। বঙ্কুবাবা বারবার সাবধান করে দিয়েছিলেন, ওরে পঞ্চানন্দ, তোকে যে চৌম্বক খড়মজোড়া দিয়েছি, সেটা ছাড়া কখনও বেরোসনি, পিছলে যাবি তা তাড়াহুড়োয় সে-কথা ভুলে খালিপায়ে বেরিয়ে ওই বিপত্তি। সাতদিন জ্ঞান ছিল না। পরে জ্ঞান-টান ফিরল, খাদ থেকে হাঁচোড়পাঁচোড় করে উঠেও এলাম। কিন্তু যে আমি উঠে এলাম, সে আসল পঞ্চানন্দ না পঞ্চানন্দর ভূত, তা মাঝে-মাঝে ঠিক করতে পারি না মশাই। এমনও হতে পারে যে, খাদে পড়ে আমি অক্কা পেয়েছিলাম আর আমার ভূতটা উঠে এসেছে। আর চোর কি না ? মশাই, আমি লুকোব না আপনার কাছে, হাতটার দোষ আমার বহুদিনের।"

জরিবাবু কী বলবেন তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তবে দুর্বল গলায় একবার ডাকলেন, "ওরে ন্যাড়া, এদিকে আয়।"

"ন্যাড়া! ন্যাড়ার অবস্থা আপনার চেয়েও খারাপ। একটু আগে দেখে এসেছি শয্যা নিয়েছেন।"

ছয়

জরিবাবু ক্ষীণ গলায় বললেন, "তাহলে উপায় ?"

"কিসের উপায় খুঁজছেন খোলসা করে বলে ফেলুন, উপায় বাতলে দেব। পঞ্চানন্দ থাকতে উপায়ের অভাব কী ? আপনার বাবাকেও কত উপায় বাতলে দিয়েছি। পাগল-ছাগল মানুষ, কখন কী করে বসেন তার ঠিক নেই। মাঝে-মাঝে বিপাকেও পড়ে যেতেন খুব। একবার তো কী একটা ওষুধ বানিয়ে খেয়ে বসেছিলেন। আমি তাঁর জাদুঘরের বারান্দায় শুয়ে আছি। নিশুত রাত্রি। হঠাৎ 'হাউরে মাউরে' চেঁচানি শুনে কাঁচা ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসেছি।

তারপর দৃশ্য দেখে চোখ চড়কগাছে। কী দেখলাম জানেন? সামনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একটা লোক।"

জরিবাবু হাঁ করে শুনছিলেন, এবার নিশ্চিন্তের শ্বাস ফেলে বললেন, "লোক! যাক বাবা, আমি ভাবলাম বুঝি…"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলল, "উহুঁ, অত নিশ্চিত হবেন না। লোক বলেছি বলেই কি আর লোক। এমন লোক কখনও দেখেছেন যার মুণ্ডু নেই, হাত নেই, পা নেই, চোখ চুল নখ কিছু নেই, তবু লোকটা আছে?"

"আজ্ঞে না।"

"মাঝরাতে আমি উঠে যাকে দেখলাম তারও ওই অবস্থা। তার গলার স্বর শুনছি, ধুতি-পাঞ্জাবি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু লোকটা গায়েব। কিছুক্ষণ, মশাই, আমার হাতেপায়ে সাড় ছিল না। তারপর গলার স্বর শুনে আর পাঞ্জাবির বুকপকেটের ছেঁড়াটা দেখে বুঝতে পারলাম যে, অদৃশ্য লোকটা আসলে শিববাবু, আপনার স্বর্গত পিতামশাই।"

"বলেন কী?"

"যা বলছি স্রেফ শুনে যান। বিশ্বাস না করলেও চলবে। তবে কিনা ঘটনাটা নির্জলা সত্যি। শিবুবাবু তো আমার হাত জাপটে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন' 'ওরে পঞ্চু, তুই না বাঁচালে আর আমার রক্ষে নেই। সলিউশন এ এন ফর্টি খেয়ে এই দ্যাখ আমার অবস্থা। স্রেফ গায়েব হয়ে গেছি, আয়নায় ছায়া পড়ছে না, নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। একটু খুঁজে দে বাবা। ওরে, আমি আছি তো!"

"বটে!"

"তবে আর বলছি কী? আমি ঠাহর করে করে বাবুর মাথাটা খুঁজে হাত বুলিয়ে বললাম, 'অত চেঁচামেচি করবেন না। লোক জড়ো হয়ে যাবে। ঠাণ্ডা হয়ে বসুন, আমার মাথায় ফন্দি এসে গেছে।' তারপর কী করলাম জানেন?"

"কী করলেন?"

"বলছি, তার আগে বেশ ভাল করে একটা পান খাওয়ান দেখি। কালোয়াতরা শুনেছি গলা সজুত রাখতে পান আর জর্দা খায়। তা আপনার বেশ ভালো জর্দা আছে তো?"

জরিবাবু এবার অনেকটা স্বাভাবিক গলায় বললেন, "আছে।"

"লাগান একখানা জম্পেশ করে।"

জরিবাবুর হাত এখনও কাঁপছে। তবু পেতলের বাটা থেকে এক খিলি সাজা পান আর জর্দা পঞ্চানন্দকে দিয়ে নিজেও এক খিলি খেলেন। বললেন, "তারপর?"

পঞ্চানন্দ জরিবাবুর পিতলের পিকদানিতে পিক ফেলে কিছুক্ষণ আরামে চোখ বুজে পানটা চিবিয়ে নিমীলিত চোখে বলল, "ফন্দিটা এমন কিছু নয়। ওর চেয়ে ঢের বেশি বুদ্ধি আমাকে খেলাতে হয়। করলাম কি, সেই রাতের

মতো শিববাবুকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে পরদিন সকালেই বাজারে গিয়ে খানিকটা তেলরং কিনে আনলাম। তারপর শিবুবাবুর হাতে-পায়ে-মুখে খুব যত্ন করে রং লাগাতেই ফের আসল মানুষটা ফুটে উঠল। বলতে নেই, আপনার বাবামশাই বেশ কালোই ছিলেন। আমি এক পোঁচ ফর্সা করে দিলাম। একটা মুশকিল হল, চোখে তো আর রং লাগাতে পারি না। তাই একজোড়া পরকলা পরিয়ে দিতে হল। দিব্যি দেখাত। তাই বলছিলাম, পঞ্চানন্দ থাকতে উপায়ের অভাব?"

জরিবাবু হাঁ করে শুনতে শুনতে জর্দাসুদ্ধ পিক গিলে ফেলে হেঁচকি তুলতে তুলতে বললেন, "বাবাকে রং করলেন?"

"তবে আর বলছি কী? কেন, টের পাননি আপনারা? শিবুবাবুর গায়ের রংটা ছিল আদতে তেলরং।"

"আর কখনও ওরিজিন্যাল চামড়া ফুটে ওঠেনি?"

"তাই ওঠে? সলিউশন এ এম ফর্টি বড় সাংঘাতিক জিনিস। তবে উপকারও হত। একবার রহিম শেখ পড়ল একটা মিথ্যে খুনের মামলায়। লোকটা ভাল, সাতচড়ে রা নেই। তবু কপাল খারাপ। এসে শিবুবাবুর হাত জাপটে ধরল, শিবু, বাঁচাও।' তখন শিবুবাবুর অগতির গতি ছিলাম আমি। উনি এসে আমাকে বললেন, 'রহিম আমার ছেলেবেলার বন্ধু রে পঞ্চু, একটা উপায় কর'। আমি তখন দিলাম সলিউশন এ এম ফর্টি এক চামচ ঠেসে। রহিম শেখ গায়েব হয়ে গেল। দিব্যি খায় দায়, ফূর্তি করে বেড়ায়, পুলিশের নাকের ডগা দিয়েই ঘোরে, পুলিশ রহিম শেখকে খুঁজে-খুঁজে ওদিকে নাচার হয়ে পড়ে। সে ভারী মজার ঘটনা। তা এ-রকম আরও কিছু-কিছু লোককে আমরা গায়েব করে দিয়েছিলাম বটে। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ এখনও আছে। কখনও অশরীরী গলার আওয়াজ পান না?"

জরিবাবু আঁতকে উঠলেন। তারপর চারপাশটা সন্দিগ্ধ চোখে একটু দেখে নিয়ে বললেন, "ঠিক মনে পড়ছে না।"

"একটু চেপে মনে করার চেষ্টা করুন। এখনও দু'চারজন ঘোরাফেরা করে। একটু আগে আপনার ঘরে ঢোকার মুখেই কার সঙ্গে যেন একটা ধাক্কা লাগল। ব্যাটাকে ধরতে পারলাম না। আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল। তবে আছে তারা।"

"ওরে বাবা! ধাক্কাও দেয়?"

পঞ্চানন্দ খুব হাসল। পানের পিক ফেলে বলল, "ধাক্কা তো ভাল জিনিস। ইচ্ছে করলে কত কী করতে পারে। আপনাকে পছন্দ হল না তো গলাটাই রাত্তিরে নামিয়ে দিয়ে গেল, কি তানপুরার তারগুলো ছিঁড়ে তব্‌লা ফাঁসিয়ে রেখে গেল। কেউ তো আর তাদের ধরতে পারছে না।"

"তাহলে কী হবে?"

"এর জন্য আপনার বাবাই দায়ী। ওষুধটা পরীক্ষা করতে যাকে-তাকে

ধরে এনে খাইয়ে দিতেন। লোকগুলো ভাল কি মন্দ তা খুঁজে দেখতেন না। তাই রহিম শেখের মতো লোকও যেমন আছে তেমনি কালু-গুন্ডা, নিতাই-খুনে, জগা-চোরেরও অভাব নেই। কখন যে কী করে বসে তারা!"

"ওরে বাবা!"

"তবে আপনি ভয় পাবেন না। পঞ্চানন্দ তো আর ঘোড়ার ঘাস কাটে না। তার কাছেও জরিবুটি আছে। শিবুবাবু আমাকে একটা দোরঙা কাচের চশমা দিয়ে গেছেন। পাঁচজনের হাতে দেওয়া বারণ। তবে সেই চশমা চোখে দিলেই আমি অদৃশ্য লোকগুলোকে পরিষ্কার দেখতে পাই। আমি থাকতে চিন্তা নেই।"

"আপনি থাকবেন তো?"

"দেখি ক'দিন থাকতে পারি। হিমালয়ও বড় ডাকছে। দেখি কতদিন মনটাকে বেঁধে রাখতে পারি।"

জরিবাবু পানের ব্যাটাটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আর একটা পান ইচ্ছে করুন।"

"করলাম। আহা বেশ পান। সেই কাশীতে থাকতে একবার রাজা ললিতমোহন খাইয়েছিল। বড় মিঠে আর মোলায়েম পাতা।"

"আমি আপনাকে রোজ খাওয়াব।"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলল, "সে হবে'খন। তা ইদিকে শীতটাও পড়েছে এবার জেঁকে, ইয়ে, আপনার বেশ নরম কম্বল-টম্বল নেই। একখানা ধার পেলে হত।"

"হ্যাঁ আছে। নেবেন?"

"ধার হিসেবে। জাদুঘরের বারান্দাতেই তো শুতে হবে রাতে। ঠান্ডা লাগবে।"

জরিবাবু শশব্যস্তে বলেন, "তা কেন, আমার পাশের ঘরখানাই এমনি পড়ে থাকে। আপনি বাবার বন্ধু, থাকবেন সে তো সৌভাগ্য আমাদের। তবে আপনার কথায় মনে পড়ল, কিছুদিন আগে সন্ধেবেলায় পিছনের উঠোনে ঘুরে ঘুরে একটু সুর তৈরি করার সময় হঠাৎ যেন আমার গায়েও কে একটু আলতো করে ধাক্কা মেরেছিল।"

"অ্যাঁ?"

"আজ্ঞে হাঁ, তখন মনে হয়েছিল মনের ভুল। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ব্যাপারটা তা নয়। আরও কথা আছে..."

"অ্যাঁ! কী সর্বনাশ!"

"সেদিন সকালে রেওয়াজের সময় কিছুতেই রেখাবটা লাগাতে পারছিলাম না। হঠাৎ কানের কাছে কে যেন গলা খেলিয়ে সুরটা ধরিয়ে দিল। তখন মনে হয়েছিল, গলাটা বোধহয় খৈয়াম খাঁয়ের। তা যে নয়, এখন বুঝতে পারছি। আমার বাবা কি কোনও গায়ককে অদৃশ্য করে দিয়েছিলেন?"

পঞ্চানন জর্দাসুদ্ধ পানের পিক গিলে ফেলে হেঁচকি তুলতে লাগল। জবাব দিতে পারল না।

সাত

হরিবাবুর বড় দুই ছেলের নাম হল ঘড়ি আর আংটি। পোশাকি নাম অবশ্য আছে, সেটা কেবল স্কুলের খাতায়। দুজনেই অতি দুর্দান্ত প্রকৃতির দুষ্টু। সামলাতে সবাই হিমসিম।

ছুটির দিনে আজ দুজনেই গিয়েছিল জেলা স্কুলের সঙ্গে ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে। দু' ভাইয়ের আর তেমন কোনও গুণ না থাকলেও তারা খেলাধুলোয় খুব ভালো। তল্লাটে খেলোয়াড় হিসেবে দুজনেরই বেশ নাম ডাক। হরিবাবু অবশ্য খেলাধুলো পছন্দ করেন না। তিনি কবি মানুষ এবং মনে প্রাণে কবি বলেই বোধহয় এসা স্থূল খেলাধুলোকে তাঁর ভারী ছেলেমানুষি বলে মনে হয়। ফুটবলের নাম শুনলে তিনি আঁতকে উঠে বলেন, "বর্বরতা। ফুটবল মানেই হচ্ছে গুঁতোগুঁতি, ল্যাং-মারামারি, ঢুসোঢুঁসি, বর্বরতা।" ক্রিকেটের কথা শুনলে নাক সিঁটকে বলেন, "কে যেন বলেছে ক্রিকেট হল উইলো কাঠের কবিতা। ছ্যাঃ, সে-লোকটা কবিতার ক-ও বোঝে না। ডাংগুলি, স্রেফ ডাংগুলি, সাহেবরা মান বাঁচাতে নাম দিয়েছে ক্রিকেট।"

বলা বাহুল্য হরিবাবু দৌড়ঝাঁপ লাফালাফিও পছন্দ করেন না। তিনি চান সকলে সব সময়ে শান্তশিষ্ট হয়ে থাকুক। চেঁচামেচি ঝগড়া কাজিয়া না-করুক। কথা কম বলুক। আরও বেশি করে ভাবুক। কবিতা ছাড়া অন্য কোনও বিষয় নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে ভালবাসেন না। কপালদোষে তাঁর বড় এবং মেজো ছেলে ঘড়ি আর আংটি স্বভাবে হয়েছে বিপরীত। দুটোই দুর্দান্ত বর্বর।

হরিবাবুর বড় ছেলে ঘড়ি খুবই ভাল ব্যাটসম্যান। আংটি বোলার। ফুট-বলও তারা খুবই ভাল খেলে। দৌড়ঝাঁপেও কম যায় না। বিনোদবিহারী হাইস্কুল যে জেলার মধ্যে খেলাধুলোর সেরা, তা এই দুজনের জন্যই।

জেলা স্কুলের সঙ্গে বিনোদ হাই-এর রেষারেষি অনেক দিনের। এ-বছর কলকাতা থেকে তিন-চারটি টাটকা খেলোয়াড় ছেলে এসে ভর্তি হওয়ায় জেলা স্কুলের জেল্লা বেড়ে গেছে। জেলা ক্রিকেট লিগে তারা ইতিমধ্যেই প্রায় সব স্কুলকে গো-হারা হারিয়ে দিয়েছে। আশিষ রায় নামে তাদের একজন পাকা ব্যাটসম্যান আছে। দেবর্ষি ভট্টাচার্য দুরন্ত ফাস্ট বোলার, একজন গুগলিবাজও আছে—মদন মালাকার। তিনজনেরই দারুণ নামডাক। কলকাতায় এরা ফার্স্ট ডিভিশনে খেলত।

জেলা স্কুলের ক্যাপটেন আশিস টসে জিতে ব্যাট নিল।

বিনোদ হাই-এর ক্যাপটেন ঘড়ি তার দলকে প্যাভিলিয়নের সামনে জড়ো করে বলল, "জেলা স্কুলের প্রধান ভরসা আশিস। সে নামবে ওয়ান ডাউন।

ওদের ওপেনার নাড়ু আর গণেশের মধ্যে গণেশটা গেঁতো, সহজে আউট হবে না। সুতরাং আমরা কনসেনট্রেট করব নাড়ুর ওপর। তাকে চটপট ফেলে আশিসকে মুখোমুখি এনে ফেললেই আসল লড়াই শুরু হবে। মনে রেখো, আশিসের অফ সাইড স্ট্রোক ভাল নয়। আংটি, তুই অফ স্টাম্পে বা অফ স্টাম্পের বাইরে বল দিবি। জ্যোতি, তুইও অ্যাটাক করবি অফ স্টাম্প। ক্যাচ যেন আজ একটাও মাটি না ছোঁয়।"

বিনোদ হাই-এর লেখাপড়ায় নাম না থাকলেও খেলায় খুব সুনাম। তাই মাঠ ভেঙে পড়েছে লোকে। লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের এইটাই চূড়ান্ত খেলা। যে জিতবে, সে-ই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে। কাজেই উত্তেজনা স্বাভাবিক।

প্রবল হাততালির মধ্যে নাড়ু আর গণেশ ব্যাট করতে নামল। গণেশ প্রথম বোলারের মোকাবিলা করবে। ঘড়ি একটু ভেবে বলটা জ্যোতির হাতে দিয়ে বলল, "প্রথম ওভারটা তুই-ই কর। বেশি জোরে বল করার দরকার নেই। লেংথটা রেখে যাস। গণেশ রান নেবে না, শুধু বাঁচিয়ে যাবে।"

তাই হল। জ্যোতি গুড লেংথে মিডল স্টাম্প লক্ষ্য করে বল দিয়ে গেল। তার তিনটে বল ছিল ইন-সুইঙ্গার। গণেশ দেখে দেখে প্রতিটি বল ব্লক করে গেল।

দ্বিতীয় ওভার বল করতে এল আংটি। তার বলে জোর বেশি, বৈচিত্র্যও বেশি। দু'রকম সুইং আছে তার হাতে, তার ওপর মাঝে-মাঝে অফকাটার বলও দিতে পারে। নাড়ু একটু ছটফটে ব্যাটসম্যান। মারকুট্টা বলে সে দ্রুত রান তুলে দেয়। আবার আউটও হয় চটপট।

আংটি আজ উত্তেজনাবশে প্রথম বলটাই লেংথে ফেলতে পারল না। একটু ওভারপিচ হয়ে গেল। নাড়ু দেড় পা এগিয়ে এসে সেটাকে মাটিতে পড়ার আগেই লং অভ দিয়ে চাবকে বাইরে পাঠাল। চার। প্রবল হাততালি।

দ্বিতীয় বল করতে গিয়ে আংটি বলটা ফেলল গুড লেংথে, তবে লেগ স্টাম্পের বাইরে সোজা বল। নাড়ু একটা চার মেরে গরম হয়েছিল। বলটাকে ব্যাকফুটে সরে গিয়ে হুক করল। আবার চার।

ঘড়ি এগিয়ে এসে আংটিকে বলল, "লোপ পা বলই দিয়ে যা। এবার শর্ট পিচ, লেগ স্টাম্পের বাইরে। আমি দেবুকে ডিপ ফাইন লেগে রাখছি। ও ক্যাচ ফেলে না।"

আংটি দাদার নির্দেশমতো লেগ স্টাম্পের বাইরে শর্ট পিচ বল দিল। যে-কোনও ব্যাটসম্যানের কাছে এর চেয়ে লোভনীয় বল আর নেই। নাড়ু ব্যাক-ফুটে সরে গিয়ে বলটাকে স্কোয়ার লেগ দিয়ে বুলেটের গতিতে চালিয়ে দিল। আবার চার' এবং ক্যাচ উঠলই না।

আংটির মতো সাংঘাতিক বোলারের প্রথম তিন বলেই তিনটে চার হওয়ায় মাঠে রীতিমত উত্তেজনা; জেলা স্কুলের সমর্থকদের হাততালি আর উল্লাস থামতেই চায় না।

চতুর্থ বলটা করার আগে আংটি একটু ভেবে নিল। আবার একটা লোপ্পা বল দিলে নাড়ু যদি আবার চার মারে, তাহলে ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠবে তার পক্ষে।

তবু দাদার নির্দেশ সে ফেললও না। ঘড়ি ক্যাপটেন হিসেবে খুবই ভাল। স্কোয়ার লেগে বাউন্ডারির কাছ-বরাবর সে আর-একজন ফিল্ডারকে টেনে এনেছে।

আংটি দৌড় শুরু করল এবং বেশ ধীরগতির শর্ট পিচ বলটা ফেলল আবার লেগ স্টাম্পের বাইরে। বলটা সামান্য উঠল। নাড়ুকে পায় কে। ব্যাকফুটে সরে গিয়ে সে বলটাকে সপাটে আকাশে তুলল ছয় হাঁকড়াতে।

বলটা ছয় হয়েই মাঠের বাইরে পড়ছিল। কিন্তু স্কোয়ার লেগ-এর ফিল্ডার মোহন বিশাল লম্বা। হাতে পায়ে ভীষণ চটপটে। নাড়ুর ছয়ের মার যখন সীমানা ঘেঁষে নেমে আসছিল, সে তখন শুধু পা দুখানা মাঠের ভিতরে রেখে লম্বা হাত বাড়িয়ে শূন্যেই বলটা নিঃশব্দে লুফে নিল। মাঠটা হঠাৎ নিঃশব্দ হয়ে গেল এই ঘটনায়। তারপর তুমুল উল্লাসে ফেটে পড়ল বিনোদ হাই-এর সমর্থকরা।

আশিস যখন এসে গার্ড নিল, তখন তার মুখে কোনও উদ্বেগ নেই। আত্মবিশ্বাসে ঝলমল করছে সে।

ঘড়ি এগিয়ে এসে আংটিকে বলল, "এবার ঠিক করে বল দে। গুড লেংথ অফ স্টাম্পের ওপর।"

আংটি তার স্বভাবসিদ্ধ দৌড় শুরু করল এবং দুর্দান্ত জোরে শরীর ভেঙে বলটা করল। গ্রিপ-এ কোনও ভুল ছিল না। বলটা বাতাস কেটে ইনসুইং হয়ে গুড লেংথে পড়ে অফ স্টাম্পে ছোবল তুলল। এ বল ব্যাটসম্যানকে খেলতেই হয়। ছেড়ে দেওয়া বিপজ্জনক। এল বি ডবলিউ বা বোল্ড হওয়ার সম্ভাবনা।

আশিস বলটাকে সোজা ব্যাটে খেলল।

খেলল, আবার খেললও না। কারণ বলটা ছিল কোনাচে। যতখানি ফ্রন্টফুটে এগোনো দরকার ছিল, আশিস ততটা এগোনোর সময় পায়নি। কারণ সে প্যাভিলিয়নে বসে দেখেছে, আংটি বল ফেলেছে লেগ স্টাম্পের বাইরে। সুতরাং সে-রকমই আশা করেছিল। আচমকা অফ স্টাম্পেয় বল তাকে কিছুটা অপ্রস্তুত করেছিল বোধহয়।

আটকানোর জন্য বাড়ানো ব্যাটের কানা ছুঁয়ে বলটা স্লিপের দিকে ছিটকে গেল। মাত্র ছ' ইঞ্চি উঁচু হওয়া সেই বলটা একটু নিচু হয়ে ঘড়ি তুলে নিল চিতাবাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মাঠ ফেটে পড়ল উল্লাসে।

এক ওভারে দুই উইকেট পাওয়া আংটি একটু হাসল।

পরের ব্যাটসম্যান রঘু। ঠাণ্ডা মেজাজের ছেলে। অনেকটা গণেশের মতোই। তবে প্রথম কয়েক ওভার সে আনতাবাড়ি খেলে, সেট হতে সময় নেয়।

ঘড়ি আংটির কানে-কানে বলে গেল, "মিডল স্টাম্পে বল রাখিস। ইয়কার গোছের।"

আংটি মাথা নাড়ল। ঠিক আছে।

ওভারের শেষ বলটায় উইকেট পেলে হ্যাট্রিক হবে। কিন্তু হ্যাটিকের চিন্তা মাথায় থাকলে বলটা ঠিকমতো দেওয়া যাবে না। তাই আংটি মনে-মনে দাদুর ল্যাবরেটরির ভূতটার কথা ভাবতে ভাবতে রান আপ করতে গেল।

হ্যাঁ, তার দাদুর ল্যাবরেটরির ভূতটাকে সে বেশ কয়েকবার দেখেছে। লম্বামতো, জোব্বা পরা। গভীর রাতে ল্যাবরেটরির ধারেকাছে ঘোরাঘুরি করে। দাদু নিজেই নয় তো!

শেষ বল। আংটি দৌড় শুরু করল। তার রান আপ একটু কোনাচে, সে দৌড়য় সহজ সাবলীল মসৃণ গতিতে। ডান হাতটা দোল খায়।

দৌড়ে এসে বলটাকে বাতাসে ছেড়ে দিয়ে পায়ে ব্রেক কষল আংটি। বলটা পড়ল ওভারপিচে। ব্যাটের তলায়। তারপর ইঁদুরের মতো ব্যাট পিচের ভিতরের ছোট্ট ফাঁকটুকু দিয়ে গলে গিয়ে মিডল স্টাম্পকে মাটিতে শুইয়ে উইকেট কিপার শম্ভুর হাতে গিয়ে জমা হল।

হট্টগোলে কানে তালা লাগবার উপক্রম। বিনোদ হাই-এর কয়েকজন সমর্থক মাঠে ঢুকে আংদিকে কাঁধে নিয়ে খানিক নাচানাচি করে ফিরে গেল। এর পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। আংটি আর জ্যোতির দুমুখো ধারালো আক্রমণে জেলা স্কুল বাষট্টি রানে গুটিয়ে গেল। আংটি কুড়ি রানে সাত উইকেট নিল। দুটি জ্যোতি। একজন রান আউট।

ঘড়ি সাধারণত ওপেন করে না। আজ করল। ইচ্ছে করেই। দেবর্ষির ওভারটা তাকেই খেলতে হবে। মনোবল যদি ভাঙতে হয়, তবে প্রথম ওভারেই। মার পড়লে বোলারের বল ঢিলে হয়ে যায়।

গুনে গুনে পাঁচটা বাউন্ডারি মারল ঘড়ি। লেট কাট, কভার ড্রাইভ, অফ ড্রাইভ, অন ড্রাইভ, আর একটা অফ স্টাম্পের বল অফ-এর দিকে সরে গিয়ে স্কোয়ার লেগ-এ হুক।

মাত্র আট ওভারেই বিনা উইকেটে জয়ের রান তুলে নিল বিনোদ হাই।

আট

খেলার শেষে দুই ভাইকে কাঁধে নিয়ে বিনোদ হাই-এর ছেলেরা মাঠে চক্কর দিল। কত লোক যে এসে পিঠ চাপড়াল, ভীম আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল আর হ্যান্ডশেক করল, তার হিসেব নেই। অভ্যেস না থাকলে এরকম আদরের আতিশয্যে শরীরে ব্যথা হওয়ার কথা। তবে কিনা ঘড়ি আর আংটির খেলার মাঠে এরকম পাইকারি ভালবাসা অনেক পেয়েছে।

বিনোদ হাই-এর গেম-স্যার পাঠান সিং। নামটা পাঠানি হলেও আসলে তিনি নির্ভেস বাঙালি। ছেলেবেলা থেকেই বীরত্বের প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ।

পাঠানরা যে বীরের জাত, তাও তাঁর জানা ছিল। তাই ম্যাট্রিকের ফর্ম পূরণ করার সময় তিনি নিজের পল্লব নামটা পাল্টে অম্লানবদনে পাঠান করে দিলেন। এর জন্য হেডস্যারের বেত এবং বাপের চটির ঘা সহ্য করতে হয়েছিল বিস্তর। কিন্তু একবার ম্যাট্রিকের ফর্মে যে নাম উঠে যায়, তা নাকি আর পাল্টানো যায় না। পাঠানবাবু খেলা-পাগল মানুষ। নিজেও সব রকম খেলা-ধুলো করেছেন যৌবন-বয়সে। কোনও খেলাতেই বিশেষ নামডাক হয়নি। তবে গেম-স্যার হিসেবে তিনি চমৎকার। ছেলেদের প্রাণ দিয়ে খেলা শেখান। ঘড়ি আর আংটি তার বিশেষ ভক্ত।

হৈ-চৈ একটু থামলে এবং পুরস্কার বিতরণ শেষ হলে পর পাঠানবাবু এসে ঘাড় আর আংটিকে চুপি-চুপি আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, "তোমাদের ভাগ্য খুবই ভাল। আজ হাতরাশগড়ের মহারাজা নারনারায়ণ রায় মাঠের পাশে ওঁর গাড়িতে বসে তোমাদের খেলা দেখেছেন। ভদ্রলোকের নাম শোনা ছিল, আগে কখনও চোখে দেখিনি। তবে বিশাল ধনী। ওঁর খুব ইচ্ছে তোমাদের ভাল করে খেলা শেখার সুযোগ করে দেবেন। খরচ সব ওঁর। খেলা শেষ হওয়ার পর ওঁর সেক্রেটারি এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল মহারাজার কাছে।"

দুই ভাই একটু অবাক হয়ে মুখ-তাকাতাকি করতে লাগল।

পাঠানবাবু হেসে বললেন, "কপাল যখন ফেরে, এমনি করেই ফেরে। এখন চলো, মহারাজ তোমাদের জন্য বসে আছেন।"

পাঠানবাবুর পিছু-পিছু দুই ভাই গিয়ে দেখে, জামতলায় বিশাল একখানা পুরনো মডেলের গাড়ি দাঁড়ানো। জানালার পর্দা রয়েছে বলে ভিতরে কিছু দেখা যায় না। তবে দরজার কাছেই মহারাজের লম্বা সুড়ুঙ্গে চেহারার সেক্রেটারি অপেক্ষা করছিল। কাছে যেতেই খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে দরজা খুলে গলা খাঁকারি দিল।

ভিতর থেকে বিশাল চেহারার এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। যেমন লম্বা, তেমনি চাওড়া। ভুঁড়ি নেই, চর্বি নেই, বেশ শক্তপোক্ত শরীর। বয়সও বড়জোর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। পরনে কালো স্যুট। মহারাজার গায়ের রং খুব ফর্সা নয়, তবে চেহারায় বেশ একটা অহংকারী আভিজাত্যের ছাপ আছে। চোখে হালকা রঙের গগলস এবং মোটা গোঁফ থাকায় বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল মহারাজাকে।

মহারাজা হাত বাড়িয়ে দুই ভাইয়ের সঙ্গে যখন হ্যান্ডশেক করলেন, তখনই ঘড়ি আর আংটি বুঝে গেল যে, মহারাজার একটি হাতেই দশটা হাতির জোর। হ্যান্ডশেকের পর দুই ভাই-ই গোপনে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতটা একটু মালিশ করে নিল।

মহারাজ যখন হাসলেন, তখন দেখা গেল তার দাঁতের পাটিও খুব সুন্দর এবং ঝকঝকে। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর। সেই স্বরেই বললেন, "একটা জরুরী কাজে এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। ক্রিকেট খেলা হচ্ছে দেখে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে-

ছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু তোমরা এমন খেলাই দেখালে যে, শেষ অবধি কাজে আর যাওয়াই হল না। যাগকে. আমি ঠিক করে ফেলেছি, তোমাদের দুজনকে কলকাতায় পাঠাব। ভাল কোচের কাছে খেলা শিখবে। ফার্স্ট ডিভিশনে খেলার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। পড়াশুনো এবং হস্টেলে থাকার খরচ আমার এস্টেট থেকে দেওয়া হবে। রাজি ?"

আলাদিনের প্রদীপ থেকে জিন বেরিয়ে এলে যেমন হত, দুই-ভাইয়ের এ-কথায় সেইরকমই হল। কিছুক্ষণ কথা-টথা এলই না মুখে।

পাঠান-স্যার তাড়াতাড়ি বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব রাজি। এত বড় সুযোগ কি আর পাবে।..."

ঘড়ি একটু ঘাড় চুলকে বলল, "বাবাকে একবার জিজ্ঞেস না করে তো কিছু বলা যাবে না "

মহারাজ হাসলেন, বললেন, "আরে সে তো আমি জানি। তবে আমি যখন ডিসিশন নিই, তখন সেটা কাজে করে তুলতে দেরি আমার সয় না। তোমাদের বাবার কাছে এখনই গিয়ে মত করিয়ে নিচ্ছি। ওঠো, গাড়িতে ওঠো।"

এই বলে মহারাজা গাড়ির ভিতরে ঢুকে গেলেন। সেক্রেটারি দরজাটা ধরে রেখে ঘড়ি আর আংটিকে ইশারা করলে উঠে পড়তে। দুই ভাই একটু ইতস্তত করে উঠে পড়ল। তাদের পিছু-পিছু পাঠান-স্যারও উঠতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেক্রেটারি পট করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে একটু কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, "সরি স্যার, গাড়িতে আর জায়গা নেই।"

পাঠানবাবু কাচুমাচু হয়ে ফিরে গেলেন।

গাড়ির ভিতরে দুই ভাই বাইরের এই ঘটনা কিছু টের পেল না। তবে গাড়ির ভিতরকার ব্যবস্থা দেখে তারা মুগ্ধ। নরম গদি। সামনে পা ছড়ানোর অনেকটা জায়গা। মেঝেয় পুরু কার্পেট পাতা। তা ছাড়া বাইরের কোনও শব্দ আসে না ভিতরে। সামনের সিট আর পিছনের সিটের মাঝখানে একটা কাচের পার্টিশন দেওয়া। কেউ কারও কথা শুনতে পায় না।

দুই ভাইয়ের মধ্যে ঘড়ি একটু বেশি বুদ্ধিমান, এবং তার পর্যবেক্ষণও বেশ তীক্ষ্ণ। গাড়ি ছাড়ার পরেই তার খেয়াল হল যে, পাঠান-স্যার গাড়িতে ওঠেননি। পিছনে তারা তিনজন, এবং সামনে সেই সেক্রেটারি বসে গাড়ি চালাচ্ছে। ঘড়ি আরও লক্ষ্য করল যে মহারাজা, তাদের বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন না। গাড়ি কিন্তু বেশ স্পিডে চলছে।

মহারাজা একদৃষ্টে সামনের দিকে চেয়ে ছিলেন। সেইভাবে বসে থেকেই বললেন, "তোমাদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, আজকাল খেলাধুলোর কদর খুব বেশি। ভাল খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। সঙ্গে একটু লেখা-পড়া জানা থাকলে তো কথাই নেই।"

ঘড়ি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আপনি নিজেও নিশ্চয়ই খেলাধুলো কিছু

করেন।"

মহারাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ইচ্ছে তো খুবই ছিল, কিন্তু এস্টেট আর ব্যবসা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে, সময় দিতে পারি না। একসময়ে আমি অ্যামেরিকায় মার্শাল আর্ট শিখতাম। বেসবলও খেলেছি। তবে এখন আর কিছু করি না।"

ঘড়ি খুব সন্তর্পণে আংটিকে একটা চিমটি দিল।

দুই ভাইয়ের মধ্যে বোঝাপড়া চমৎকার। চিমটি খেয়ে আংটি চমকাল না বা কোনও প্রশ্ন করল না। কিন্তু হঠাৎ একটু সোজা হয়ে বসল। দাদা তাকে সাবধান হতে বলছে।

গাড়িটা শহর ছাড়িয়ে এসেছে। কিন্তু ঠিক কোন পথে যাচ্ছে তা বোঝা মুশকিল। গাঢ় খয়েরি রঙের পর্দায় জানালাগুলো একদম ঢাকা। সামনের কাচ দিয়েও কিছু দেখার উপায় নেই। কারণ, পিছনের সিটের গদি নিচু এবং গভীর। সামনের সিটটা অনেকটা উঁচু বলে উইন্ডস্ক্রিনটাকে আড়াল করে আছে।

ঘড়ি হঠাৎ বলল, "মহারাজ, আমরা কোনদিকে যাচ্ছি?"

"কেন, তোমাদের বাড়িতে।"

"আপনি কি আমাদের বাড়ি চেনেন?"

মহারাজা একটু হাসলেন। তারপর পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে নাকটা চাপা দিয়ে বললেন, "আমার সেক্রেটারি চেনে।"

ঘড়ি আংটির পায়ে ছোট্ট একটা লাথি মারল।

কিন্তু দুই ভাই এখনও বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা কী ঘটছে। একটু প্রস্তুত ও সতর্ক হয়ে বসে থাকা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার নেই।

মহারাজা হঠাৎ একটু কাসলেন। তারপর পিছনে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজলেন। নাকটা তেমনই রুমালে চাপা দেওয়া।

হঠাৎ ঘড়ি আর আংটি মৃদু অস্বস্তিকর একটা গন্ধ পেল। ঘড়ি আর আংটির বহুবার হাত-পা ভেঙেছে। কয়েকবার হাসপাতালে হাড় জোড়া দিতে তাদের অজ্ঞান করা হয়েছে। অজ্ঞান করার জন্য ব্যবহৃত গ্যাসের গন্ধ তাদের চেনা। এ গন্ধটা অনেকটা সেইরকম।

ঘড়ি আংটির দিকে চেয়ে চাপা, প্রায় নিঃশব্দ গলায় বলল, "অ্যাকশন।"

মারপিট দাঙ্গাবাজিতে দুজনেই সিদ্ধহস্ত। তার ওপর মহারাজা চোখ বুজে আছেন।

আংটি হাতের পাঞ্জাটা শক্ত করে আচমকা তরোয়ালের মতো সেটা চালিয়ে দিল মহারাজার গলায়। একই সঙ্গে ঘড়ি আর-একটা ক্যারেটে চপ বসাল মহারাজার মাথার পিছন দিকটায়।

নিঃশব্দে মহারাজা দরজার দিকে ঢলে পড়লেন। মাথাটা কাত হয়ে লটপট করতে লাগল।

মহারাজার সেক্রেটারী কিছু টের পাওয়ার আগেই ঘড়ি তার দিককার দরজাটার হাতল ঘুরিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল। গাড়ির স্পিড একটু কমলেই দরজা খুলে লাফিয়ে পড়বে।

নয়

আচমকা একটা মোড়ের কাছে গাড়ির স্পিড কমে গেল। সামনে একটা ছৈ-ওলা গোরুর গাড়ি রাস্তা জুড়ে চলেছে। এই রকম সুযোগ আর আসবে না।

ঘড়ি দরজাটা ঠেলল। কিন্তু বল্টু-আটুনিতে দরজা এঁটে আছে। ঘড়ি হাতলটা ওপরে নীচে দ্রুত ঘুরিয়ে ঠেলা এবং ধাক্কা দিতে লাগল প্রাণপণে। কপালে একটু ঘামও দেখা দিল তার। কিন্তু দরজা যেমনকে তেমন আঁট হয়ে রইল।

হঠাৎ একটা হাই তোলার শব্দে দুই ভাই-ই চমকে উঠে ডান দিকে তাকিয়ে দেখে মহারাজ নরনারায়ণ সকৌতুকে তাদের দিকে চেয়ে আছেন। আর একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে বললেন, "দরজাটা লক করা আছে। সহজে খুলবে না, খামোখা চেষ্টা করছ।"

দুই ভাই বেকুব হয়ে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে থাকে। মহারাজ নরনারায়ণ লম্বাচাওড়া লোক সন্দেহ নেই। কিন্তু দু-দুটো প্রাণঘাতী ক্যারাটে চপ খেয়েও এত স্বাভাবিক থাকা চাট্টিখানি কথা নয়।

ঘড়ি আর আংটির মুখে কথা সরছে না দেখে মহারাজ নিজেই সদয় হয়ে বললেন, "এত ব্যস্ত হওয়ার কিছুই ছিল না। তোমাদের আমার প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে একটু আপ্যায়ন করা হবে। তারপর বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা ভাবা যাবে। এখন হাত-পা না ছুড়ে চুপ করে বসে থাকলেই আমি খুশি হব।"

ঘড়ি আর আংটি পরস্পরের দিকে একটু তাকাল। আংটির রোখ আছে, জেদিও বটে, কিন্তু সে সবসময় তার দাদাকে মেনে চলে। ঘড়ির গুণ হল, সে চট করে কিছু করে না, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে করে। মহারাজাকে আক্রমণ করাটা হয়তো একটু ভুলই হয়ে থাকবে। ঘড়ি তো জানত না যে, মহারাজ অনেক উঁচুদরের খেলোয়াড়।

বুদ্ধি খেলিয়ে ঘড়ি চট করে স্থির করে ফেলল, আর গা-জোয়ারি দেখিয়ে লাভ নেই। এখন তালে তাল দিয়ে চলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তাই সে খুব অমায়িকভাবে একটু হেসে হাত কচলাতে-কচলাতে বলল, "আমরা ভয় পেয়ে ওরকম করে ফেলেছি। আপনার বেশি লাগেনি তো?"

রাজা নরনারায়ণ নিজের গলায় একটু হাত বুলিয়ে বললেন, "আংটি আর তুমি যে দুটো মার বসিয়েছ তাতে যে-কোনও লোকের মরে যাওয়ার কথা। তোমরা দুজনেই সাক্ষাৎ-খুনে।"

আংটি মুখখানা থোতা করে বলল, "কিন্তু আপনি তো মরেননি।"

নরনারায়ণ একটু হেসে বললেন, "রূপকথার গল্পে পড়োনি, সেই যে রাক্ষসের প্রাণভোমরা থাকে জলের তলায় একটা স্তম্ভের মধ্যে সোনার কৌটোয়? আমারও হল সেরকম। সোজাসুজি আমাকে মারা অসম্ভব। তবে যদি কোনওদিন আমার প্রাণভোমরাটাকে খুঁজে পাও তাহলে পুটুস করে আমাকে মেরে ফেলতে পারবে। কিন্তু কাজটা শক্ত।"

ঘড়ি আর আংটি ফের চোরা চোখে দৃষ্টি বিনিময় করে নিল। ঘড়ি ইঙ্গিতে ভাইকে জানাল, মহারাজার মাথায় গোলমাল আছে।

মহারাজ তাদের দিকে দৃক্‌পাতও করলেন না। পিছনে নরম গদিতে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজে বললেন, "আমি ক্লান্ত। বুঝলে? খুব ক্লান্ত। একটু বিশ্রাম নিতে দাও।"

ঘড়ি আর আংটি কাঠ হয়ে বসে রইল।

গাড়ি কোন্ দিকে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে তা তারা বুঝতে পারছে না। তবে এটা বুঝতে পারছে, গাড়ির মধ্যে একটু আগে তারা যে ঘুমপাড়ানি ওষুধের গন্ধ পেয়েছিল সেটা মোটেই ঘুমপাড়ানি ওষুধ নয়। তাদের মতো দুর্বল ও অসহায় দুটি ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে গুম করার প্রয়োজনই নরনারায়ণের নেই।

তবে গন্ধটা খুব অদ্ভুত। চুপচাপ বসে থেকে ঘড়ি টের পেল এই গন্ধটা শ্বাসের সঙ্গে যতবার ভিতরে যাচ্ছে ততবারই সে যেন বেশ তরতাজা আর ঝরঝরে হয়ে উঠছে। তবে গন্ধটা কিসের তা সে জানে না।

একটু বাদে গাড়িটা একটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকল। সামনের উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, বিশাল বিশাল গাছ। চারদিকটা অন্ধকার-অন্ধকার। রাস্তাটাও বেশ এবড়ো-খেবড়ো। গাড়িটা লাফাচ্ছে, ঝাঁকুনি খাচ্ছে।

জঙ্গলের ভিতরে প্রায় পনেরো মিনিট চলার পর গাড়ি ধীরে-ধীরে গতি কমাল। তারপর দাঁড়িয়ে গেল।

সামনের সিট থেকে ড্রাইভার তড়াক করে নেমে পিছন দিকের দরজা খুলে বংশবদ ভঙ্গিতে দাঁড়াল।

প্রথমে মহারাজ এবং তাঁর পিছু পিছু ঘড়ি আর আংটি নেমে এল। ওদের ভাবখানা নিপাট বাধ্য ছেলের মতো।

জঙ্গলের মধ্যে একটু ফাঁকা একটা জায়গা। কোথাও কোনও প্রাসাদ দূরে থাক কুঁড়েঘরেরও চিহ্ন নেই। তবে সামনে বড় বড় কোমরসমান ঘাসজঙ্গলের মধ্যে ভগ্নস্তূপের মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে বটে।

সন্ধে্য হয়ে এসেছে। জঙ্গলের মধ্যে বেশ শীত। ঘড়ি আর আংটি শীতের বাতাসে একটু কেঁপে উঠল। খানিকটা শীতে, খানিকটা ভয়ে।

ঘড়ি আড়চোখে চারদিকটা দেখে নিচ্ছিল। যে রাস্তা দিয়ে গাড়িটা তাদের এইখানে নিয়ে এসেছে সেটা কাঁচা রাস্তা। রাস্তাটা এখানে এসেই শেষ হয়ে গেছে। চারদিককার জঙ্গল তেমন ঘন নয়। ঘড়ি শুনেছে তাদের বাড়ি থেকে

কিছু দূরে হাতরাশের জঙ্গল আছে। একটা ছোট নদীও আছে সেখানে। মাঝে-মাঝে শীতকালে ছেলেরা দল বেঁধে চড়ুইভাতি করতে যায়। কেউ কেউ পাখি শিকার করতেও আসে। এটাই সেই জঙ্গল কি না কে জানে, সে কখনও হাতরাশের জঙ্গলে যায়নি।

দেখেশুনে ঘড়ির মনে হল, হঠাৎ যদি তারা দুই ভাই খুব জোরে দৌড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যায় তা হলে এই নকল রাজা আর তাঁর সুড়ঙ্গে সেক্রেটারির হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। এদের মতলব যে ভাল নয় তা এতক্ষণে জলের মতো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

মহারাজা গাড়ি থেকে নেমে খুব আলস্যভরে আড়মোড়া ভাঙলেন। তারপর ঘুম-ঘুম চোখে চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সেক্রেটারি গুনগুন করে কী যেন বলছে। একটু দূরে দাঁড়ানো জড়োসড়ো দুই ভাই কিছু বুঝতে পারছে না।

ঘড়ি আংটির দিকে চেয়ে চোখের একটা ইশারা করল। তারপর আড়চোখে মহারাজ আর তাঁর সেক্রেটারিকে দেখে নিল। না, ওঁরা তাদের লক্ষ্য করছেন না।

ঘড়ি আর আংটি একটু হাত-পা ঝেড়েঝুড়ে নিল। বড় দৌড়ের আগে ওয়ার্ম-আপ করতে হয়, না হলে পেশীতে টান ধরে। তবে বেশিক্ষণ ওয়ার্ম-আপ করার সময় নেই। দু-একটা লাফ-ঝাঁপ দিয়ে একটু ওঠবোস করে নিয়ে দুই ভাই পরস্পরের দিকে চেয়ে চোখে-চোখে কথা বলে নিল।

তারপর জেলার দুই বিখ্যাত স্পোর্টসম্যান হঠাৎ বিদ্যুৎগতিতে দৌড়ে সামনের ঘাসজঙ্গলে গিয়ে পড়ল। জঙ্গলের মধ্যে ছুটবার হাজারো অসুবিধে। কিন্তু প্রাণের দায় বড় দায় এবং ভয় জিনিসটা মানুষকে অনেক অসাধ্য সাধন করায়।

দুই ভাই ঘাস-জঙ্গলটা প্রায় চোখের পলকে পার হয়ে গেল। লাফিয়ে লাফিয়ে এবং বড় বড় পা ফেলে। ধ্বংসস্তূপটা ডানদিকে, সেদিকে তারা গেল না। বাঁ দিক দিয়ে কোনাকুনি দৌড়ে তারা বড় বড় গাছের জঙ্গলে ঢুকে গেল।

ঘড়ি একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল রাজা বা সেক্রেটারি কী করছেন। অবাক হয়ে সে দেখল, তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও না করে রাজা আর সেক্রেটারি তখনও কথা বলে যাচ্ছেন।

লোকগুলো কি বোকা? নাকি অতিশয় ধূর্ত? ভাবতে ভাবতে ঘড়ি দৌড়তে থাকে। পাশাপাশি আংটি।

আংটি জিজ্ঞেস করল, "কী হল রে দাদা? কেউ তো পিছু নিল না?"

"তাই তো ভাবছি।"

"লোকটা কি খুব পাজি?"

"মনে তো হয়।"

"তা হলে আমাদের পালাতে দিল কেন?"

"বুঝতে পারছি না।"

"রাজা তো প্রাসাদের কথা বলছিলেন। সেই প্রাসাদই বা কোথায় ?"

"কী করে বলব ? তবে দৌড়োতে থাক। এখন পালানোটাই বড় কথা।"

"লোকটার হয়তো কুকুর আছে। লেলিয়ে দেবে।"

"বন্দুকও থাকতে পারে। দৌড়ো।"

দুই ভাই নিঃশব্দে দৌড়োতে থাকে। জঙ্গলটা খুব ঘন নয়। কিন্তু অন্ধকার হয়ে আসায় সব কিছু আস্তে-আস্তে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। জঙ্গলের মধ্যে কুয়াশাও উঠছে জমাট বেঁধে। কোথায় যাচ্ছে তা তারা বুঝতে পারছে না।

দশ

কেউ তারা করছে না দেখে ঘড়ি আর আংটি দৌড়ের গতি কমিয়ে দিল। কুয়াশা এবং গাছগাছালির জন্য জোরে দৌড়নো সম্ভবও নয়। অন্ধকারও হয়ে এসেছে। দুলকি চালে দৌড়াতে দৌড়াতে ঘড়ি বলল, "খুব বেঁচে গেছি। লোকটার গায়ে ভীষণ জোর।" আংটি বলল, "শুধু জোরই নয়, যে-দুটো সাংঘাতিক ক্যারাটের মার হজম করল, তাতেই বোঝা যায় মারপিটের লাইনের লোক। রাজা-ফাজা কিছু নয়।

বড় বড় গাছ সংখ্যায় কমে আসছে। জঙ্গলটা ফাঁকা-ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। ঘড়ি সামনের দিকে চেয়ে বলল, "আমরা বড় রাস্তার কাছাকাছি এসে গেছি মনে হচ্ছে।"

বাস্তবিকই তাই। সামনে একটা বড়-বড় ঘাসের জঙ্গল। তারপরই বড় রাস্তা। সামনে একটা লরি মেরামত হচ্ছে। এক-আধটা সাইকেলও যাচ্ছে আসছে।

লোকজন দেখে দুই ভাই নিশ্চিন্ত হয়ে রাস্তায় উঠে এল। দু'পাশে তাকিয়ে দেখল, মহারাজার গাড়ির কোনও চিহ্নই নেই। এ জায়গাটা ঘড়ি বা আংটির চেনা জায়গা নয়। এদিকটায় তারা কখনও আসেনি।

হাট সেরে কয়েকজন গেঁয়ো লোক ফিরছিল। ঘড়ি তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করল, "এ জায়গাটার নাম কী ?"

"হরিহরপুর।"

"আমরা শহরের দিকে যাব। কী ভাবে যাওয়া যায় ?"

লোকটা একটু অবাক হয়ে বলল, "তার ভাবনা কী ? একটু বাদেই বাস-গাড়ি এসে যাবে। চেপে বসলেই শহরে নিয়ে গিয়ে তুলবে। ওই বোধহয় আসছে, এ পাশটায় দাঁড়িয়ে হাত তুলুন।"

ঘড়ি আর আংটি দেখল সত্যিই একটা বাস আসছে। খুবই লজ্ঝড়ে চেহারা। ভিড়ে ভিড়াক্কার। ভিড় দেখে তারা আজ খুশিই হল।

বাসে উঠে দুই ভাই ভিড়ের ভিতর সেঁদিয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণে একটু

নিশ্চিন্ত লাগছে।

দু'তিনটে স্টপ পার হওয়ার পর কিছু লোক হুড়মুড় করে নেমে যেতে বাসটা হঠাৎ বেশ ফাঁকা হয়ে গেল।

হঠাৎ আংটি চাপা স্বরে বলল, "দাদা, পিছনে দ্যাখ।"

ঘড়ি তাকিয়ে দেখে থ হয়ে গেল! পিছনের সিটে জানালার ধারে একটা সুড়ুঙ্গে লম্বা লোক বসে বসে ঢুলছে। বাসের আবছা আলোতেও লোকটার চেহারা ভুল হওয়ার নয়। রাজা নরনারায়ণের সেক্রেটারি।

লোকটা কী করে বাসের মধ্যে এল বুঝতে পারল না ঘড়ি। তবে সে চাপা স্বরে বলল, "মুখ ঘুরিয়ে রাখ। দেখতে পাবে।"

লোকটা অবশ্য দেখল না। বসে-বসে যেমন ঢুলছে তেমনই ঢুলতে লাগল। আড়চোখে চেয়ে ঘড়ি মাঝে-মাঝে দেখছিল, লোকটার ঘাড় লটপট করছে। মাথাটা বাসের ঝাকুনিতে মাঝে-মাঝে জোরসে ঠুকে যাচ্ছে জানালায়। তবু কী ঘুম বাবা! একটুও চোখ মেলল না।

বাস থামছে। লোকজন নামা-ওঠা করছে। সেক্রেটারি নির্বিকার ঘুমোচ্ছে বসে বসে।

আংটি চাপা স্বরে বলল, "দাদা, লোকটা বোধহয় আমাদের দেখতে পেয়েছে। ঘুমের ভান করে নজর রাখছে।"

ঘড়ি তীক্ষ্ন চোখে আর একবার দেখে নিয়ে মাথা নেড়ে বলল, "তাও হতে পারে, তবে সাবধানের মার নেই। মুখটা আড়াল করে থাক।"

একটু বাদে কয়েকজন লোক নেমে যাওয়ার পর দুই ভাই বসবার জায়গা পেয়ে গেল। বসে দুজনেই মাথা নামিয়ে রেখে আড়ে-আড়ে নজর রাখতে লাগল।

আশ্চর্যের বিষয়, সুড়ুঙ্গে সেক্রেটারি একবারও চোখ মেলল না বা তাদের দিকে তাকাল না। সেক্রেটারির পাশে বসা লোকটা মাঝে-মাঝে বিরক্ত হয়ে ধমক দিচ্ছিল, "ও মশাই, গায়ের ওপর ওরকম হেলে পড়ছেন কেন? সোজা হয়ে বসুন না।"

কিন্তু সেক্রেটারির তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

পাশে বসা লোকটা গেঁয়ো প্রকৃতির। বেশ জোরে-জোরেই গজগজ করে বলতে লাগল, 'সেই হরিহরপুর থেকেই এমন কাণ্ড শুরু করেছে যে, অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম! এমন গায়ে-পড়া লোক জন্মে দেখিনি বাবা। কতবার সোজা হয়ে বসতে বলছি, তা ইনি কথাটা কানেই তুলছেন না। চাষার ঘুমকেও হার মানিয়ে দিয়েছেন।"

ঘড়ি আর আংটি সবই শুনল। পরস্পরের দিকে একটু তাকিয়ে নিল দু'জনে।

সামনের একটা গঞ্জে বাসটা দাঁড়াতেই পেছনের সিট থেকে সেক্রেটারির পাশে বসা লোকটা একটা পুঁটুলি নিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং নেমে পড়ল। সেক্রেটারি

জানালায় হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

অনেকে নেমে যাওয়ায় সেক্রেটারির পাশে আর কেউ বসল না। বাস প্রায় ফাঁকা। আর দু' মাইল দূরে শহর।

বাসটা আবার ছাড়তেই হঠাৎ পিছনের সিটে একটা বিকট শব্দ শোনা গেল। সকলে চমকে চেয়ে দেখে, সুড়ুঙ্গে সেক্রেটারি মেঝের ওপর পড়ে আছে সটান হয়ে।

হৈহৈ করে ওঠে লোকজন, "পড়ে গেছে···অজ্ঞান হয়ে গেছে···জল··· পাখা···"

ঘড়ি আর আংটি খানিকটা থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি অন্য সব লোকজনের সঙ্গে মিলেমিশে এগিয়ে গিয়ে দেখল।

যা দেখল, তাতে তাদের চোখ চড়কগাছ। এরকম ঘটনা তারা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি।

লোকজন প্রচণ্ড চেঁচাতে লাগল, "রক্ত···রক্ত···উরেব্বাস রে···খুন··· খুন···"

খুন যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেক্রেটারি উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সমস্ত পিঠটা রক্তে ভাসাভাসি মাখামাখি।

বাস থেমে গেল। লোকজন সব নেমে পড়তে লাগল দুড়দাড় করে। বাইরে চেঁচামেচি শুনে আবার লোকজন জুটেও গেল অনেক।

এই চেঁচামেচি আর বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঘড়ি মাথা ঠাণ্ডা রেখে চটপট যা দেখার দেখে নিল। সেক্রেটারির পরনে সেই নীলচে ধূসর রঙের সুটটাই রয়েছে। লোকটার মাথার চুল পাতলা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। পায়ে বেশ ঝাঁ-চকচকে একজোড়া জুতো।

রক্তে-মাখা পিঠটার ঠিক মাঝামাঝি মেরুদণ্ডের ওপর একটা ছ্যাঁদা লক্ষ্য করল ঘড়ি। বন্দুক বা পিস্তলের গুলিই হবে, ঘড়ি আরও লক্ষ করে, যেখানে সেক্রেটারি বসেছিল ঠিক সেইখানে বাসের পেছন দিককার সিটেও একটা ফুটো। সন্দেহ নেই কেউ পিছন থেকে গুলি চালিয়েছে; সেই গুলি বাস ফুটো করে সেক্রেটারির শরীরে ঢুকে গেছে। সম্ভবত মৃত্যুও হয়েছে তৎক্ষণাৎ। কিন্তু কোণের দিকে ভিড়ের চাপে সেঁটে বসে ছিল বলে এতক্ষণ পড়ে যায়নি।

ঘড়ি চাপা গলায় বলল, "আংটি, চল্, কেটে পড়ি। এখানে আর থাকা বিপজ্জনক।"

আংটি মাথা নেড়ে বলে, "সেই ভাল।"

দুই ভাই নেমে পড়ল।

এ জায়গাটা তাদের চেনা। বহুবার এসেছে। লালমণিপুর। এখানে মণ্টু নামে ঘড়ির এক বন্ধু থাকে; বেশ বড়লোক।

ঘড়ি বলল, "চল, মণ্টুর মোটর সাইকেলটা নিয়ে ফিরে যাই।"

মণ্টুর বাড়ি বেশি দূরে নয়। রাস্তার ওপরেই তাদের বিশাল বাগানঘেরা বাড়ি।

মণ্টু বাড়িতেই ছিল। তারা যেতেই বেরিয়ে এসে বলল, "আরে! তোদের কী খবর বল তো! আজ এত বড় একটা ম্যাচ জেতার পর কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছিলি? সবাই তোদের খোঁজ করে অস্থির। কোন্ রাজা নাকি তোদের নিয়ে গেছে।"

ঘাড় বেশি ভাঙল না। বলল, "পরে সব বলব। এইন তোর মোটর সাইকেলটা দে। বাড়ি ফিরতে হবে।"

এগারো

দুই ভাই মোটরসাইকেল দাবড়ে যখন বাড়ি ফিরল তখন বেশ একটু রাত হয়ে গেছে। বাড়ির লোক চিন্তা করতে শুরু করেছে। হরিবাবু বাইরের বারান্দায় পায়চারি করতে করতে স্বগতোক্তি করছেন, "মরবে···মরবে, দুটোই একদিন বেঘোরে মরবে। ওসব বর্বর খেলার পরিণতি ভাল হওয়ার কথা নয়। ফাইনার সেন্স নষ্ট হয়ে যায়, বুদ্ধি লোপ পায়, হিংস্রতা আসে, মানুষ পশু হয়ে যায়···"

খেলাধুলো জিনিসটা যে এত খারাপ তা পঞ্চানন্দ জানত না। সে "খুব গম্ভীর মুখে হরিবাবুর পিছু পিছু পায়চারি করছিল। আর মাঝে-মাঝে "খুব ঠিক কথা", "বেড়ে বলেছেন", "সে আর বলতে"—এইসব বলে যাচ্ছিল।

হরিবাবু তার দিকে চেয়ে হঠাৎ বললেন, "তুমি তো অনেক ফিকির জানো। ছেলে দুটোর কী হল একটু দেখবে?"

পঞ্চানন্দ বিগলিত হয়ে বলল, "আজ্ঞে বৃথা ভেবে মরছেন। আপনার ছেলে দুটো তো আর দুধের খোকা নয়। ঠিক ফিরে আসবে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হরিবাবু বললেন, "দুধের খোকা যে নয় তা আমি বিলক্ষণ জানি। দুটোই ভয়ংকর রকমের ডাকবুকো গুণ্ডা। প্রায়ই মারপিট করে আসে। ওদের শত্রুর অভাব নেই। তার কেউ যদি গুম-খুন করে বসে, তা হলে কী হবে?"

পঞ্চানন্দ মাথা চুলকে বলল, "তা হলে তো খুবই মুশকিল।"

হরিবাবু একটু কঠিন চোখে পঞ্চানন্দের দিকে চেয়ে বললেন, "ওবেলা তো দিব্যি খ্যাট চালালে।"

পঞ্চানন্দ বিগলিত হয়ে বলল, "আজ্ঞে সে আর বলতে। মাংসটা কিন্তু মশাই খুব জমে গিয়েছিল। আর-একটু ঝাল হলে কথাই ছিল না। তারপর ধরুন পোলাওয়ের কথা! তারটা খুব উঠেছিল বটে, তবে কিনা জাফরান না পড়লে পোলাও ঠিক যেন পোলাও-পোলাও লাগে না। তবে ফুলকপির রোস্ট গিন্নিমা একেবারে সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন বটে···"

হরিবাবু কঠিন গলায় বললেন, "খ্যাঁট ফের এ-বেলাও তো চালাবে।"

পঞ্চানন্দ মাথা চুলকে বলল, "আজ্ঞে হিমালয়ে গিয়ে যখন থাকি, তখন দিনান্তে একটা পাকা হর্তুকি ছাড়া কিছুই জোটে না। এই আপনাদের কাছে যখন আসি-টাসি, তখনই যা আজ্ঞে, একটু ভালমন্দ জোটে। বলতে নেই আজ্ঞে শ্রীভগবানের আশীর্বাদে এ-বেলাও একটু খ্যাঁট চালানোর ইচ্ছে আছে।"

"তা চালাবে চালাও, কিন্তু বসে-বসে খাওয়া আমি অপছন্দ করি। যাও গিয়ে ছেলে দুটোর একটা হদিস করে এসো।"

পঞ্চানন্দ মাথা চুলকে বলল, "প্রস্তাবটা মন্দ নয়। হাঁটাহাটি দাপাদাপি করলে খিদেটাও চাগাড় দিয়ে উঠত। কিন্তু মুশকিল কী জানেন। আপনার ছেলেদের তো আমি চিনি না। আপনাদেরই সব ছোট-ছোট দেখেছি। সেই আপনারা বড় হলেন, ছেলের বাপ হলেন, ভাবতেও অবাক লাগে। ভাবি দুনিয়াটা হল কী!"

হরিবাবু যথেষ্ট রেগে গলা রীতিমত তুলে বললেন, "ওসব বাজে কথা ছাড়ো। তুমি না চিনলেও ঘড়ি আর আংটিকে তল্লাটের সবাই চেনে। জিজ্ঞেস করে-করে খোঁজ নাও। শুনেছি, কোনও রাজা নাকি তাদের নিয়ে গেছে।"

পঞ্চানন্দ অবাক হয়ে বলে, "রাজা! এ তল্লাটে আবার রাজা-গজা কে আছে বলুন তো?"

"সে কে জানে। হাতরাশগড়ে একসময়ে রাজা ছিল একজন। সে কবে মরে হেজে গেছে। তা সে জমিদারি রাজত্বও কিছুই তো আর নেই। সব জঙ্গল হয়ে আছে। তাই ভাবছি হাতরাশের রাজা আবার কে এল ঘড়ি আর আংটিকে নিয়ে যেতে! কোনও বদমাশের পাল্লায় পড়ল না তো!"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলল, "আজকাল গুণ্ডা-বদমাশের অভাব কী। চার-দিকেই তো তারা—"

হরিবাবু খেঁকিয়ে উঠে বললেন, "সেইজন্যই তো খোঁজ নিতে বলছি।"

"যাচ্ছি আজ্ঞে।"

তবে পঞ্চানন্দকে যেতে হল না। বারান্দা থেকে সে সবে সিঁড়িতে পা বাড়িয়েছে, এমন সময় বিকট শব্দে হুড়মুড় করে একটা বিশাল মোটরসাইকেল এসে গা ঘেঁষে ব্রেক কষল। পঞ্চানন্দ সড়াত করে পা টেনে নিয়ে বলল, "বাপ রে!"

হরিবাবু কটমট করে ঘড়ি আর আংটির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর বিকট হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "কোথায় ছিলি?"

ঘড়ি আর আংটি খুবই দামাল আর দুরন্ত বটে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তারা তাদের নিরীহ কবি-বাবাকে ভীষণ ভয় পায়। হরিবাবু তাদের কখনও মারধর করেননি, এমনকী বকাঝকাও বিশেষ করেন না। বলতে কী, ছেলেদের খোঁজ-খবরই তিনি কম রাখেন। তবু ঘড়ি আর আংটি বাপের সামনে পড়লে

কেমন যেন নেংটি ইঁদুরের মতো হয়ে যায়।

দুই ভাই মোটর সাইকেল থেকে নেমে কাঁচুমাচু হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়াল।

"কোথায় গিয়েছিলি? মোটরবাইকই বা কোথায় পেলি? কতবার বলেছি না মোটরবাইক, সাইকেল, এসব হল শয়তানের চাকা? দু' চাকায় যে গাড়ি চলে তাকে কোনও বিশ্বাস আছে?"

ঘড়ি গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "আমরা একটু এই এক বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম।"

কথাটা মিথ্যে, তবে ঘড়ি জানে তাদের বাবা খুব ভিতু মানুষ। তারা যে বিপদে পড়েছিল, সে-কথা বললে বাবার সারা রাত আর ঘুম হবে না।

হরিবাবু অত্যন্ত সন্দিহান চোখে মোটরবাইকটার দিকে চেয়ে বললেন, "ওটা কার?"

"আমাদের এক বন্ধুর। রাস্তায় বাস খারাপ হয়ে যাওয়ায় চেয়ে এনেছি।"

হরিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, "ওটা ফেরত দেওয়ার সময় ঠেলে নিয়ে যাবে। খবর্দার চাপবে না। মনে থাকবে?"

ঘড়ি ঘাড় কাত করে বলল, "থাকবে।"

"এখন যাও। তোমাদের মা খুব দুশ্চিন্তায় আছেন। জরি, ন্যাড়া সব খুঁজতে বেরিয়েছে তোমাদের।"

হরিবাবুর পিছন থেকে পঞ্চানন্দ দুই ভাইকে দেখে নিচ্ছিল ভাল করে। মুখে বিগলিত হাসি। ঘড়ি আর আংটি ঘরে চলে যাওয়ার পর সে বলল, "বেশ দুষ্টু-দুষ্টু আর মিষ্টি-মিষ্টি দেখতে হয়েছে খোকা দুটি।"

হাত-মুখ ধুয়ে জামাকাপড় পাল্টে দুই ভাই নিজেদের ঘরে যখন মুখোমুখি বসল, তখন দু'জনেরই মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

আংটি বলল, "দাদা, এখনও আমি ঘটনাটি কিছু বুঝতে পারছি না।"

ঘড়ি প্রথমে উত্তর দিল না। ভ্রূ কুঁচকে ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "আমিও না।"

"সেক্রেটারিকে কে মারল, কেন মারল, তা আন্দাজ করতে পারিস?"

"দূর! কী করে আন্দাজ করব? শুধু মনে হচ্ছে, পিছন থেকে কেউ গুলি করেছে।"

"সেক্রেটারি বাসে করে যাচ্ছিল কোথায়? আমাদের খোঁজ নিতে নয় তো!"

ঘড়ি হাত উল্টে বলল, "কে জানে! নরনারায়ণই বা আমাদের পাকড়াও করেছিল কেন তাও তো বুঝতে পারছি না।"

সমস্যার কোনও সমাধান সহজে হওয়ার নয় বুঝে ঘড়ি আর আংটি সোজা দাবার ছক পেতে বসে পড়ল।

দাবা খেলায় দুজনেই ওস্তাদ। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, কোনও সমস্যায় বা বিপদে পড়লে ঘড়ি সবসময়ে এক বা দুই পাট্টি দাবা খেলে নেয়।

তাতে তার মনের ভাবটা সহজ হয়ে যায়।

হরিবাবু দাবা খেলা পছন্দ করেন না, তাস খেলা দু' চোখে দেখতে পারেন না। তাই দুই ভাই গোপনে বসে দাবা খেলে।

* * *

ওদিকে ছেলেরা বাড়ি ফিরে আসায় হরিবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে পঞ্চানন্দকে বললেন, "ওহে পঞ্চানন্দ, ইয়ে, আমার ঘরে চলো গিয়ে একটু বসি।"

"তা চলুন। বসতে আর আপত্তি কী?"

"ইয়ে বলছিলাম, আজ সন্ধেবেলায় ইয়ে একটা ওই লিখেছিলাম আর কি।"

"জিনিসটা একটু ভেঙে বলুন। কথা সবসময়ে খোলসা করে বলবেন, তাতে মনটা পরিষ্কার থাকে।"

"ইয়ে একটা কবিতা আর কি।"

"কবিতা? তা সে-কথা বলতে অত কিন্তু-কিন্তু করছেন কেন বলুন তো। কবিতা তো ভাল জিনিস। কবিতা ঝুড়ি-ঝুড়ি লিখে ফেলবেন। যত লিখবেন ততই ভাল।"

হরিবাবু খুব লাজুক মুখে বললেন, "না ইয়ে বলছিলাম কী, তোমাকে গোটাকয় শোনাব। হয়েছে কী জানো, এ বাড়িতে কবিতার ঠিক সমঝদার নেই। আমার স্ত্রী তো কবিতার খাতা পারলে উনুনে দেন। জরিটার নাকি কবিতা শুনলেই তেড়ে জ্বর আসে। ন্যাড়াটা তো গাধা। আর আমার পিসি তো কানে শোনেন না।"

পঞ্চানন্দ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "কবিতা শুনব সে তো ভাল কথা। কিন্তু মশাই, আমার আবার একটু বিড়ি-টিড়ি না হলে এসব দিকে মেজাজটা আসে না। দুটো টাকা দিন, ঝট করে মোড়ের মাথা থেকে এক বাণ্ডিল বিড়ি আর একটা ম্যাচিস নিয়ে আসি।"

হরিবাবু দিলেন, এবং বললেন, "তুমি খুব ঘড়েল।"

বারো

গজ পালোয়ান নামটা শুনলে মনে হয় লোকটা বুঝি হাতির মতোই বিরাট আকারের। কিন্তু আসলে গজ পালোয়ানের চেহারা মোটেই সেরকম নয়, জামাকাপড় পরা অবস্থায় তাকে পালোয়ান বলে মনেই হয় না। ছিপছিপে গড়ন, লম্বাটে চেহারা, মুখচোখ নিরীহ, একটু সাধু-সাধু উদাস-উদাস ভাব। ল্যাঙট পরে খালি গায়ে যখন সে কুস্তি শেখাতে দঙ্গলে নামে, তখন তার বিদ্যুতের মতো গতি আর বাঘের মতো শক্তির খানিকটা আঁচ পাওয়া যায়। ঘুসি মেরে যে পাথর ভাঙতে পারে, দু' প্যাকেট তাস একসঙ্গে ধরে ছিঁড়ে ফেলতে পারে, তিন আঙুলের চাপে বেঁকিয়ে দিতে পারে একটা কাঁচা টাকা।

গজ খুব সাদাসিধে মানুষ। চকসাহেবের ভাঙা পোড়োবাড়ির একখানা

ঘর নিয়ে সে থাকে। আসবাব বলতে একটা দড়ির খাটিয়া, একখানা উনুন আর কয়েকটা বাসনপত্র। জামাকাপড় তার বিশেষ নেই। যা আছে তা একটা দড়িতে ঝোলে। থাকার মধ্যে আর আছে একখানা পাকা বাঁশের তেল-চুকচুকে পাঁচ-হাত লাঠি। পুরনো বাড়ি বলে মাঝে-মাঝে বিষাক্ত সাপ বেরিয়ে আসে। গজ সাপখোপ মারে না, লাঠি মেঝেয় ঠুকে শব্দ করে তাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া লাঠিটা আর কোনও কাজে লাগে বলে কেউ জানে না। তবে মানুষের সবচেয়ে বড় অস্ত্র যেটা, তা লাঠি-বন্দুক এসব নয়। সেটা হল দুর্জয় সাহস। গজ পালোয়ানের সেইটে আছে।

চকসাহেবের বাড়ি নিয়ে অনেক কিংবদন্তী আছে। চক নামে কোনও নীলকর বা অন্য কোনও সাহেব এই বাহারি বাড়িখানা বানিয়েছিল। তারা মরে-হেজে যাওয়ার পর এ-বাড়ি ছিল ডাকাতের আস্তানা। তারপর ভূতের বাড়ি হিসেবেও রটনা হয়েছিল একসময়। আস্তে-আস্তে বাড়িটা ভেঙে পড়ছে, জঙ্গলে ঢেকে যাচ্ছে। বসবাসের যোগ্য আর নেই। এই পড়ো-পড়ো বাড়িতে থাকতে যে-কারও ভয় পাওয়ার কথা। তার ওপর ভূতপ্রেত এবং সাপখোপ। গজ এই ভগ্নপ্রায় বাড়িটার জঙ্গল কেটে কুস্তির আখড়া বানিয়েছে, একটা ঘর কোনওরকমে বাসোপযোগী করে নিয়েছে। বিকেলে গুটি দশবারো ছেলে তার কাছে কুস্তি শিখতে আসে। বাকি দিনরাত সে একা থাকে। কেউ তাকে বড় একটা ঘাঁটায় না। সে কোথাকার লোক, কেন তাকে জখম অবস্থা পাওয়া গিয়েছিল, তার কে আছে, এসব খবর কেউ জানে না।

আজ রাত্রে প্রচণ্ড শীত পড়েছে। গজ খিচুড়ি রাঁধবে বলে চালে-ডালে মিশিয়ে উনুনে চাপিয়ে খাটিয়ায় বসে একটা বই পড়েছিল। চারদিকটা খুব নিঝুম। কবে পুরনো বাড়ির নানারকম শব্দ থাকেই। যেমন, একটা তক্ষক বা প্যাচাঁ ডেকে উঠল, একটা নড়বড়ে কপাট ফটাস করে বাতাসে বন্ধ হয়ে গেল, একটা বেড়াল ডেকে উঠল, মিঁয়াও। তা ছাড়া ঝিঁঝির শব্দ আছে, মশার পনপন আছে, ইঁদুরের চিকচিক আছে। এ-সব সত্ত্বেও চকসাহেবের বাড়ি খুবই নিস্তব্ধ।

গজর গরম জামা বলতে প্রায় কিছুই নেই। একটা মোটা খদ্দরের চাদর আর একখানা কুটকুটে কালো কম্বল। কম্বলখানা সে শোয়ার সময়ে গায়ে দেয়। এখন শুধু চাদরখানা জড়িয়ে বসে ছিল সে। বই পড়তে-পড়তে হঠাৎ সে উৎকর্ণ হয়ে মুখ তুলল। তার মনে হল, সে একটা অচেনা শব্দ শুনেছে। কীরকম শব্দ তা বলা মুশকিল। তবে পুরনো বাড়িতে যে-সব শব্দ হয়, সবই তার চেনা। এ-শব্দ সে-রকম নয়।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল গজ। আজ কৃষ্ণপক্ষের নিকষ অন্ধকার রাত্রি। তার ওপর গাঢ় কুয়াশা পড়েছে। এইরকম রাত্রে চকসাহেবের বাড়িতে খুব সাধারণ কেউ আসবে না। কিন্তু গজর মনে হল, সে কারও একটা পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছে।

টেমিটা এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে গজ উঠল। অভ্যস্ত জায়গা থেকে লাঠিটা হাতে তুলে নিয়ে ছায়ার মতো নিঃশব্দে সে বাইরে বেরিয়ে এল। ঘরের সামনেই একটা বারান্দা। ছাদটা অনেকদিন আগেই ভেঙে পড়ে গেছে, আছে শুধু একটু বাঁধানো চাতাল আর তিনটে থাম।

গজ একটা থামের পাশে দাঁড়িয়ে অন্ধকারেই একটা কিছু অনুভব করার চেষ্টা করল। চারদিক নিস্তব্ধ।

তবে কি গজ ভুল শুনেছে? না, সেটা সম্ভব নয়। গজকে যে অবস্থায় বেঁচে থাকতে হয়, তা সাধারণ গেরস্থ মানুষের জীবনের মতো নয়। তার কান সজাগ, চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ম, অনুভূতি প্রবল। সুতরাং তার ভুল সহজে হয় না।

যারা চোখে দেখে না, তাদের শ্রবণশক্তি এবং অনুভূতি ধীরে ধীরে তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে। এটা লক্ষ করে গজ একসময়ে দিনের পর দিন চোখে ফেট্টি বেঁধে রেখে নিজের অনুভূতি ও শ্রবণশক্তি বাড়িয়ে তুলবার চেষ্টা করেছে। যারা কানে শোনে না, তাদের দৃষ্টি থাকে সর্বদিকে। সুতরাং গজ কিছুদিন কানে তুলো গুঁজে রেখে শব্দ না শুনেও শব্দকে অনুভব করার চেষ্টা করেছে এবং ঘ্রাণ ও দৃষ্টিশক্তিকে করে তুলেছে চৌখস। গজ জানে, একটু ভুল হলেই তার প্রাণসংশয়। রাতে সে যখন ঘুমোয় তখনও তার কান এবং অনুভূতি জেগে থাকে। সামান্য একটু অস্বাভাবিক শব্দ হলেই সে তড়াক করে উঠে পড়ে। সাধারণ যে-কোনও মানুষের চেয়ে তার ঘ্রাণ, শ্রবণ এবং দৃষ্টিশক্তি বহুগুণ বেশি। সুতরাং আজও তার ভুল হয়নি।

বাগানে খোয়া-বিছানো রাস্তায় একটা নুড়ি-পাথরের গড়িয়ে যাওয়ার একটু শব্দ হল না?

গজ বারান্দা থেকে নেমে বোগেনভেলিয়ার ঝোপটার আড়ালে সরে গেল। তার শরীরের পেশিগুলো শক্ত হয়ে গেল, ঘ্রাণ-শ্রবণ-দৃষ্টিশক্তি হয়ে উঠল ক্ষুরধার। কে আসছে? কী চায়?

ঝোপের আড়ালে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল গজ। কিন্তু আর কোনও শব্দ নেই, কোনও নড়াচড়া নেই, কোনও গন্ধ নেই। কিন্তু তবু গজর মনে হতে লাগল সে এ-বাড়িতে আর একা নয়। কোনও একজন আগন্তুক এ-বাড়ির কোথাও নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে।

খিচুড়ির পোড়া গন্ধ পেল গজ। কিন্তু তবু অনেকক্ষণ নড়ল না। সে বুঝল, যে-ই এসে থাক, সে খুব তুখোড় লোক। গজর চোখ-কান-নাককে ফাঁকি দেওয়া বড় সহজ কাজ নয়।

অন্ধকারে আর একবার চারদিকে চোখ চালিয়ে গজ ধীরে-ধীরে বারান্দায় উঠল এবং ঘরে ঢুকে টেমি জ্বালাল।

খিচুড়িটা একদম পুড়ে ঝামা হয়ে গেছে। হাঁড়িটা নামিয়ে রাখল সে। তারপর টেমিটা তুলে নিয়ে এ-ঘর সে-ঘর ঘুরে দেখল। কোথাও কেউ নেই।

গজু খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। জীবনে বহুরকম বিপদে পড়েছে এবং বেঁচেও গেছে। সুতরাং বিপদকে তার ভয় নেই। তার অস্বস্তিটা অন্য কারণে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, তার চোখ-কান-নাককে ফাঁকি দিয়ে যদি কেউ এ-বাড়িতে ঢুকেই থাকে, তবে সে সাধারণ মানুষ নয়। হয়তো সে মানুষই নয়।

তবে কি অশরীরী?

গজু খুব চিন্তিতভাবে বইখানা আবার খুলে বসল। কিন্তু মন দিতে পারল না।

একটা হুলো বেড়াল ভীষণ ডাকছে কোথায় যেন। কিছু দেখতে পেয়েছে কি? খুব ভয় পেয়েছে যেন।

হঠাৎ দুটো চামচিকে অন্ধের মতো চক্কর মারতে লাগল ঘরের মধ্যে। একটা ভাঙ্গা দরজায় শব্দ হল, ক্যাঁচ।

গজু স্থির হয়ে বসে রইল। মাঠে ময়দানে, শ্মশানে কারখানায় সে বহু রাত কাটিয়েছে। কখনও ভয় পায়নি। কিন্তু আজ এই প্রচণ্ড শীতেও তার কপালটা একটু-একটু করে ঘেমে উঠছে। লাঠিটা মুঠোয় নিয়ে সে বসে রইল চুপ করে। কী করবে তা ঠিক করতে পারছিল না। বিদ্যুতের মতো যার গতি, বাঘের মতো যার শক্তি, দুর্জয় যার সাহস, সেই গজু পালোয়ান কি আজ ভয় পাচ্ছে?

হঠাৎ একা ঘরেই হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল গজু। সেই হাসির দমকে তার ভয় ভীতি উড়ে গেল। হঠাৎ শরীরে এল মত্ত হাতির ক্ষমতা। গজু পালোয়ান তার লাঠিটা নিয়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে বিকট হুঙ্কার ছেড়ে বলল, "কে রে, চোরের মতো ঢুকেছিস বাড়িতে? বাপের ব্যাটা হয়ে থাকিস তো সামনে আয়!"

কেউ এই হুঙ্কারের জবাব দিল না। চারদিক নিস্তব্ধ।

গজু পালোয়ান আবার হুঙ্কার দিল, "শুনতে পেয়েছিস? সামনে আসার মতো বুকের পাটা নেই তোর?"

গজু পালোয়ান কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল।

হঠাৎ বারান্দায় খুব মৃদু একটা পায়ের শব্দ শোনা গেল। খুব ধীর পদক্ষেপে কে যেন আসছে।

গজু শক্ত হাতে লাঠিটা ধরে অপলক চোখে দরজার দিকে চেয়ে রইল।

প্রথমে একটা ছায়া বারান্দায় গাঢ় অন্ধকারে একবার যেন নড়ে উঠল। তারপর হঠাৎ দরজায় এসে দাঁড়াল দীর্ঘ রোগা একটা লোক। এত লম্বা আর শুঁটকো চেহারার লোক গজু কখনও দেখেনি। পরনে গাঢ় রঙের একটা স্যুট। বুক থেকে সর্বাঙ্গে রক্ত ঝরে পড়ছে।

সাদা ফ্যাকাসে মুখে লোকটা গজুর দিকে একটু চেয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে ওই লম্বা শরীরটা কাটা গাছের মতো পড়ে যেতে লাগল মেঝেয়।

গজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চেয়ে রইল। এক পা নড়ার ক্ষমতাও তার ছিল না।

লোকটা মেঝের ওপর দড়াম করে পড়ে একটু ছটফট করল। তারপর নিথর হয়ে গেল।

সম্বিত ফিরে পেতে অনেকক্ষণ সময় লাগল গজর। ঘটনাটা কী ঘটল তা সে বুঝতে পারছে না। কে খুন করল লোকটাকে? কেন?

গজ পালোয়ানের অবশ হাত থেকে টেমিটা পড়ে নিবে গেল। লাঠিটাও খসে গেল মুঠো থেকে।

গজ এবার সত্যিকারের ভয় পেল। এ-ভয়ের কারণ অন্য। এ-ভয়ের সূত্র লুকিয়ে আছে তার অতীত জীবনে। সে বুঝল, যে-লোকটা তার দরজায় মরে পড়ে আছে, তার লাশ রাতোরাতি পাচার করার উপায় নেই। পুলিশ আসবে, তাকে জেরা করবে। অনেক জল ঘোলা হবে তাতে।

গজ অন্ধকারে একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। না, তাকে পালাতে হবে। সঙ্গে বিশেষ কিছু নেওয়ার নেই।

দড়ি থেকে জামাকাপড়গুলো টেনে আর বিছানা থেকে কম্বলখানা তুলে সে বিছানার চাদর দিয়ে একটা পুঁটুলি বানাল দ্রুত হাতে। বাসনকোসনগুলো পড়ে রইল। থাকগে গজকে এখনই পালাতে হবে। সময় নেই।

পোঁটলা ঘাড়ে নিয়ে গজ পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর হন হন করে হাঁটতে লাগল ফটকের দিকে।

তেরো

কবিতা শুনতে শুনতে পঞ্চানন্দ খুব বিকট একটা শব্দ করে প্রকান্ড প্রকান্ড হাই তুলছিল। হরিবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "আহা, অত শব্দ করলে কি চলে? কবিতা হল স্বর্গীয় জিনিস।"

বিনীতভাবে পঞ্চানন্দ বলল, "আজ্ঞে সে তো ঠিকই। কবিতার মতো জিনিস হয় না। এত মোলায়েম জিনিস যে কান দিয়ে ভিতরবাগে ঢুকে একেবারে বুকখানা জুড়িয়ে দিচ্ছে। ওই যে লিখেছেন লাইনটা 'ঘুম ঘুম ঘুম, ভূতের ঠ্যাং, বাদুড়ের ডানা, চাঁদের চুম' ওইটে শুনে এমন হাই উঠতে লেগেছে। ভাল জিনিসের মজাই এই। একবার রাজশাহির রাঘবসাই খেতে খেতে—খেয়েছেন তো? উরেব্বাস, কী যে সারস জিনিস—হ্যাঁ তা খেতে খেতে এমন আরাম লেগেছিল যে খাওয়ার মাঝপথেই ঘুমিয়ে পড়লাম। নাক ডাকতে লাগল। শেষে একটা ইঁদুর এসে হাত থেকে বাকি আধখানা খেয়ে নেয়। তাই বলছিলাম আজ্ঞে, ভাল জিনিস পেলেই আমার বড্ড হাই ওঠে।"

হরিবাবু করুণ চোখে পঞ্চানন্দের দিকে চেয়ে বললেন, "কিন্তু ইয়ে, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে যে আমার আর কবিতা পড়ার উৎসাহ থাকবে না।"

পঞ্চানন্দ খুব বিগলিত হয়ে দাঁত বের করে বলল, "তাহলে বরং গিন্নীমাকে

বলে পাঠান, দু'কাপ বেশ জবর করে চা পাঠিয়ে দিতে। শীতটাও জাঁকিয়ে পড়েছে। জমবে ভাল। সঙ্গে এক-আধখানা নোনতা বিস্কুট-টিস্কুট হলে তো চমৎকার। চা আবার খালিপেটে খেতেও নেই। পেটে গরম চা গেলে আপনার কবিতার সাধ্যি নেই যে, পঞ্চানন্দকে হাই তোলাবে।"

অগত্যা হরিবাবু উঠে গিয়ে চায়ের কথা বলে এলেন।

নোনতা বিস্কুট দিয়ে চা খাওয়ার পর মিনিট দশেক জেগে রইল পঞ্চানন্দ। হরিবাবু নাগাড়ে কবিতা পড়ে চলেছেন। পঞ্চানন্দ দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুম। তবে ঘুমের মধ্যের পঞ্চানন্দ মাঝে মাঝে বলে যেতে লাগল, "আহা···বেড়ে লিখেছেন···চালিয়ে যান···।" তারপর হঠাৎ ঘুম ভেঙে সোজা হয়ে বসে বলল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান, একতলা থেকে কে যেন ডেকে উঠল!"

হরিবাবু পড়া থামিয়ে অবাক হয়ে বললেন, "কই আমি শুনিনি তো!"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলল, নির্ঘাত ডেকেছে। ওই যে শুনুন।"

বাস্তবিকই শোনা গেল, নীচে থেকে বাচ্চা-চাকরটা হাঁক মারছে "বাবুরা, সব খেতে চলে আসুন। মা-ঠাকরোন ডাকছেন।"

পঞ্চানন্দ একগাল হেসে বলল, "শুনলেন তো! এ হল পঞ্চানন্দর কান। সেবার তো কৈলাস থেকে ভূতেশ্বরবাবা ডাক দিলেন আর আমি সে-ডাক গঙ্গোত্রীতে বসে শুনে ফেললুম। শিবুবাবুও বলতেন, "ওরে পঞ্চা, তোর কান তো কান নয়, যেন টেলিফোন।" তা আজ্ঞে গিন্নিমা যখন ডাকছেন তখন আর দেরি করা ঠিক নয়। খবর নিয়েছি আজ খাসির তেলের বড়া হয়েছে এ-বেলা। গরম খেলে অমৃত, ঠান্ডা হলে গোবর। দেরি করাটা আর একদমই উচিত হবে না।"

হরিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কবিতার খাতা বন্ধ করে বললেন, "তোমার কান সত্যিই খুব সজাগ।"

যাই হোক, খাওয়াদাওয়া মিটতে একটু রাতই হয়ে গেল। পঞ্চানন্দ যা খেল তা আর কহতব্য নয়। তবে কিনা গিন্নিমা অর্থাৎ হরিবাবুর স্ত্রী তাকে খুব অপছন্দ করছিলেন না।

পঞ্চানন্দ এগারোটা খাসির তেলের বড়া শেষ করে যখন মাংসের ঝোল দিয়ে একপাহাড় ভাত মাখছে তখন গিন্নিমা সামনে এসে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে তার খাওয়া দেখতে দেখতে বললেন, "এই খিদেটা পেটে নিয়ে এতকাল কোথায় ছিলে?"

পঞ্চানন্দ লজ্জা-লজ্জা ভাব করে বলল, "আজ্ঞে পাহাড়ে কন্দরেই কাটছিল আর কি! টানা বছর-দুই নিরম্বু উপোস। পাহাড়িবাবার হুকুমে দেড় বছর একটানা এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে সাধনা করতে হল। তারপর···"

গিন্নিমা চোখ পাকিয়ে বললেম, "আমি তো কর্তাবাবুর মতো কবি নই, পাগলও নই যে, যা-খুশি বুঝিয়ে দেবে। তোমার মতো হাড়হাভাতেদের আমি খুব চিনি। মিথ্যে কথা বললে দূর করে তাড়িয়ে দেব। বলি হাতটানের

অভ্যেস নেই তো ?"

পঞ্চানন্দ একটু মিইয়ে গিয়ে মিনমিন করে বলল, "খুব অভাবে পড়লে ওই একটু-আধটু। বেশি-কিছু নয়, এই ঘটিটা বাটিটা। সত্যি বলছি।"

"থাক, আর কিরে কাটতে হবে না। শোনো, এই বলে রাখছি, এ বাড়িতে থাকতে চাও থাকবে, দুবেলা দুটি করে খেতেও পাবে। তবে তার বদলে শক্ত কাজ করতে হবে। বসে খেলে চলবে না।"

পঞ্চানন্দ কাজের কথায় খুব নরম হয়ে গিয়ে বলল, "আজ্ঞে আমার হল ননির শরীর। বেশি কাজটাজ আমার আসে না।"

"তা বললে তো হবে না। কাজ না করলে সোজা বাড়ি থেকে বের করে দেব। তবে এও বলি বাছা, কাজ শক্ত হলেও বেশি পরিশ্রমের নয়। এ বাড়ির কর্তাবাবুর বড় কবিতা লেখার বাতিক। কেউ শুনতে চায় না বলে ভারী মনমরা হয়ে থাকেন। খবরের কাগজের লোকগুলোও কানা, কেউ, ছাপতে চায় না। তা এবার থেকে বাবুর কাছে-কাছে থাকবে। আর কবিতা শুনবে। পারবে তো !"

পঞ্চানন্দ একটা বিষম খেল। তারপর ঘটি আলগা করে খানিক জল গিলে নিয়ে বলল, "তা···তা পারব'খন। তবে কিনা মা-ঠাকরোন, এই বিড়িটা আশটা কিংবা একটু গরম চা, মাঝে-মাঝে চুল ছাঁটা আর দাঁড়ি কামানোর পয়সা···"

"ইঃ, আম্বা দ্যাখো, আচ্ছা সে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে কর্তাবাবুর তোমাকে বেশ ভাল লেগেছে বলেই তোমাকে রাখছি। নইলে···"

পঞ্চানন্দ সপাসপ ঝোলমাখা ভাত খেতে খেতে বলল, 'নইলে কী তা আর বলতে হবে না মা-ঠাকরোন। পঞ্চানন্দকে আজ অবধি কেউ ভাল চোখে দেখেনি। অবিশ্যি তাদের দোষও নেই।"

"আর শোনো, মিথ্যে কথাটথাগুলো একটু কম করে বোলো। তুমি নাকি আমার শ্বশুরমশাইয়ের বন্ধু ছিলে বলে বলেছ ?"

জিব কেটে পঞ্চানন্দ বলে, "ছিঃ ছিঃ, বন্ধু বললে আমার জিব খসে পড়বে যে। তবে কিনা শিবুবাবু আমাকে খুব স্নেহ করতেন। বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো বাউন্ডুলে তো আমি, তাই তাঁর জাদুই-ঘরের বারান্দায় থাকতে দিয়েছিলেন। ওরকম মানুষ হয় না।"

"আর তুমি নাকি একটা চাবি দিয়েছ কর্তাবাবুকে, সে-চাবি কিসের চাবি ?"

পঞ্চানন্দ বাঁ হাতে মাথা চুলকে বলল, "আজ্ঞে মা-ঠাকরোন, আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলে কোন্ আহাম্মক ? চাবিটা কিসের তা আমিও জানি না। তবে শিবুবাব···"

গিন্নিমা চোখ পাকিয়ে বললেন, "দ্যাখো পঞ্চানন্দ, আমাকে তোমার কর্তাবাবুর মতো গোলা লোক পাওনি। আমার শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে তোমার ভাব থাকলে এখন তোমার কত বয়স হওয়ার কথা জানো ?"

পঞ্চানন্দ খুব ভাবনায় পড়ে গিয়ে বলে, "আজ্ঞে বয়সটাও আমার নেহাত

ফেলনা নয়। তা বলতে নেই বয়স তো গিয়ে সেই…"

"থাক, থাক, তোমার ওজর আমার জানা আছে। এখন খাও, খেয়ে নিজের বাসন মেজে জায়গা পুঁছে ল্যাবরেটারির বারান্দায় গিয়ে শুয়ে থাকো।"

গিন্নিমা চলে যাওয়ার পর পঞ্চানন্দ রাঁধুনিকে ডেকে গম্ভীরভাবে বলল, "লেখাপড়া জানার ঝক্কি অনেক, বুঝলে? লেখাপড়া না শিখে খুব ভাল কাজ করেছ। আমি একটু বেড়াতে এসে কেমন ফেঁসে গেলুম দ্যাখো, বাবুর হয়ে এখন নানারকম লেখা-টেখার মুসাবিদা করতে হবে। মাথার খাটুনিটাও কিছু কম হবে না। কাল সকাল থেকে আমাকে এক গেলাস করে গরম দুধ দিও তো। আর একটা কথা, আমার কাছে একটা পোঁটলা আছে। বেশি কিছু নেই তাতে। পড়তি জমিদার বংশ তো, বেশি কিছু ছিলও না। ভরি পাঁচ সাত সোনার গয়না, কয়েকটা মোহর আর বোধহয় দশ বারোখানা হিরে, তিন চারটে মুক্তো এই সব আর কি। পোঁটলাটা তোমার কাছে গচ্ছিত রাখব। একটু লুকিয়ে রেখো। কেমন?"

রাঁধুনি একটু বোকা-সোকা লোক। সহজেই বিশ্বাস করে বলল, "যে আজ্ঞে। তা আপনি ক'দিন আছেন এখানে?"

"দেখি রে ভাই। যতদিন হিমালয় আবার না টানে ততদিন তো থাকতেই হচ্ছে। আর এরাও ছাড়তে চাইছে না। কেন বলো তো?"

রাঁধুনি মাথা চুলকে বলল, "না, ভাবছি কাল থেকে দু'বেলাই কয়েক খুঁচি চাল বেশি করে নিতে হবে। আজ রাতে আমাদের ভাতে টান পড়েছে। আপনি বেশ খান।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পঞ্চানন্দ বলল, "সেই খাওয়া আর কোথায় রে ভাই। আর খাবই বা কী দিয়ে! কাল যদি একটু ভালোমন্দ রাঁধো তো খাওয়া দেখাব, দেখলে ট্যারা হয়ে যাবে।"

"আজ্ঞে ভালমন্দ তো আজ কিছু কম হয়নি।"

"দূর পাগলা, মাংস, খাসির তেলের বড়া, ভাজা মুগের ডাল মাছের মাথা দিয়ে ফুলকপির পোড়ের ভাজা, পটলের দোড়মা এ আর এমন কী? এর সঙ্গে চিতল মাছের পেটি, ইলিশ ভাপা, কুচো মাছের টক, মুরগির কালিয়া, পায়েস আর কাঁচাগোল্লা হত তো দেখতে ভোজবাজি কাকে বলে।"

পঞ্চানন্দ আঁচিয়ে এসে বাড়ির কাজের লোকটিকে ডেকে বলল, "থালাটা ভালো করে মেজো। নোংরা কাজ একদম পছন্দ করি না।"

এই বলে সে সোজা গিয়ে জরিবাবুর ঘরে হানা দিল।

"এই যে জরিবাবু, হবে নাকি একখানা দরবারি কানাড়া? রাতটা বেশ হয়েছে। এই বেলা ধরে ফেলুন।"

জরিবাবু করুণ স্বরে বললেন, "ধরব, আবার যদি কেউ তারা চলে আসে গান শুনতে?"

"ভয় কী? আমি তো আছি। নাঃ, আজ বড় চাপনো খাওয়া হয়েছে।

আজ বরং থাক। কাল হবে। তা আমার বিছানাটা কোন্ দিকে হবে?"

জরিবাবু তাড়াতাড়ি উঠে কম্বল চাদর আর বালিশ দিয়ে বললেন, "মেঝেয় শুতে কি আপনার খুব কষ্ট হবে?"

"নাঃ, হিমালয়ে তো বরফের ওপরেই শোওয়া-টোওয়া চলত। কষ্ট কিসের?"

পঞ্চানন্দ বেশ ভাল করে বিছানা পেতে শুয়ে বলল, "বাতিটা নিবিয়ে আপনিও শুয়ে পড়ুন। সকালে আবার গলাটলা সাধতে হবে।"

জরিবাবু বাধ্য ছেলের মতো শয্যা নিলেন।

আস্তে-আস্তে দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ল। রাত্রি নিঝুম হয়ে গেল।

কিন্তু মাঝরাতে আচমকাই ঘুম ভেঙে চোখ চাইল পঞ্চানন্দ।

চোদ্দ

অন্ধকারে পঞ্চানন্দ ঘুম ভেঙে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল। তার ঘুম খুবই পাতলা। কিন্তু ঘুমটা ভাঙল কেন তা চট করে বুঝতে পারছিল না সে। কিছুক্ষণ কান খাড়া করে থাকার পর সে শুনতে পেল, কে যেন বাইরে থেকে খুব চাপা গলায় ডাকল, "ন্যাড়া! এই ন্যাড়া!" ব্যাপারটা একটু দেখতে হচ্ছে। রাত-বিরেতে চাপা গলার ডাক মোটেই সুবিধের ব্যাপার নয়। কিছু গোলমাল আছে। আর যেখানে গোলমাল এবং গন্ডগোল সেখানেই পঞ্চানন্দ জুত পায়।

কালো কম্বলটা মুড়ে নিয়ে উঠে পঞ্চানন্দ নিঃশব্দে দরজা খুলে ফেলল। তারপর বারান্দা ডিঙিয়ে উঠোন পেরিয়ে বাইরের বাগানে এসে ন্যাড়ার ঘরের জানালার দিকে গুঁড়ি মেরে এগোল।

বেশিদূরে এগোতে হল না। কুয়াশামাখা অন্ধকারে সে একজন লম্বামতো লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে টপ করে কামিনীঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিল।

লোকটা ডাকছে, "ন্যাড়া! এই ন্যাড়া!"

ন্যাড়া কুস্তিগির বলেই বোধহয় ঘুমটা খুব গাঢ়। সাড়া দিচ্ছিল না। লোকটা খানিকক্ষণ ডাকাডাকির পর বন্ধ জানালার কপাটে টোকা দিতে লাগল।

ভিতর থেকে ন্যাড়ার ভয়জড়ানো গলা পাওয়া গেল, "কে? কে?"

লোকটা চাপা গলায় ধমক মারল, "চিৎকার কোরো না। আমি গজ-পালোয়ান। জানালাটা খোলো, জরুরি কথা আছে।"

সঙ্গে-সঙ্গে জানালা খুলে গেল। ন্যাড়া শিকের ফাঁকে উঁকি মেরে অবাক হয়ে বলল, "গজদা! এত রাতে? কী ব্যাপার?"

গজ চাপা গলায় কী বলতে শুরু করল। পঞ্চানন্দ শুনতে না পেয়ে আরও একটু এগোল। বলতে গেলে গজ পালোয়ানের কোমরের হাতখানেকের মধ্যেই

তার মাথা। মাঝখানে একটা শুধু কল্লাবতীর ঝোপ।

গজ বলল, 'আমার বাড়িতে একটু আগে একটা লোক খুন হয়েছে।"

ন্যাড়া আঁতকে উঠে বলল, "সর্বনাশ!"

গজ বলল, "চেঁচিয়ো না, খুন হওয়ার ঘটনা আমি স্বচক্ষে দেখিনি। লোকটা রক্তমাখা শরীরে আমার ঘরে ঢুকেই পড়ে যায়। ঘাবড়ে গিয়ে আমি পালিয়ে আসি। কিন্তু কিছু দূর আসার পর আমার মনে হল, আগুপিছু ভাল করে না দেখে পালানোটা ঠিক হচ্ছে না। তখন আমি আবার ফিরে গেলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানো? গিয়ে দেখলাম খুন-হওয়া লোকটার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। আরও দেখলাম, আমার জিনিসপত্র বলতে যা কিছু ছিল সব কে হাঁটিকে মাটকে রেখে গেছে। তখন সন্দেহ হল, খুনটা হয়তো আসল খুন নয়। সাজানো ঘটনা। তাই বেরিয়ে যখন থানায় খবর দিতে যাচ্ছি তখন পানুর সঙ্গে দেখা। পানুকে চেনো তো? তোমাদের সঙ্গেই কুস্তি শেখে। তার মুখে আর এক আশ্চর্য ঘটনা শুনলাম। আজ একটা বাস-এ নাকি একটা লোক খুন হয়েছিল। লম্বা সুড়ুঙ্গে চেহারা। অবিকল আমরা বাসার লোকচার মতো। খুন হওয়ার পর তাকে ধরাধরি করে সকলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে আসে। হাসপাতালে তাকে ইমার্জেন্সিতে ফেলে রেখে ডাক্তাররা পুলিশে খবর দেয়। কিন্তু পুলিশ এসে দেখে ইমার্জেন্সির বেড খালি, লাশ নেই।"

"বলেন কী গজদা? এ তো ভুতুড়ে কাণ্ড?"

"হ্যাঁ। খুবই রহস্যময় ঘটনা। আমার মনে হচ্ছে দুটি ঘটনাই এক লোকের কাজ। দুবারই সে খুনের অভিনয় করেছে। কিন্তু তার কারণ কী সেটা জানা দরকার। তাই আমি ভাবছি কয়েকটা দিন তোমার এখানে একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাকব। তোমার বাড়ির লোক জানলে ক্ষতি নেই, কিন্তু বাইরের লোক না যেন জানতে পারে।"

ন্যাড়া বলল, "কোনও চিন্তা নেই গজদা। আমার বাবার ল্যাবরেটরি তো পড়েই আছে। কেউ থাকে না। চলুন, এখনই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

গজ খুশি হয়ে বলল, "বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা।"

এই পর্যন্ত শুনে পঞ্চানন্দ সুট করে সরে এল। তারপর আড়ে-আড়ে থেকে নজর রাখল।

ন্যাড়া দরজা খুলে বেরিয়ে গজ-পালোয়ানকে খাতির করে নিয়ে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢোকাল। ল্যাবরেটরির চাবি যে ন্যাড়ার কাছেই থাকে এটাও জেনে নিল পঞ্চানন্দ।

ল্যাবরেটরিতে শিবু হালদারের যা সব যন্ত্রপাতি ছিল তা আজও অক্ষত এবং যথাস্থানে সাজিয়ে রাখা আছে। কেউ নাড়াচড়া করেনি। ল্যাবরেটরির একধারে একটা সিংগল খাটে বিছানা পাতা আছে আজও। কাজ করতে করতে রাত গভীর হয়ে গেলে শিবুবাবু এখানে শুয়ে থাকতেন।

ন্যাড়া বিছানাটা ঝেড়েঝুড়ে দিয়ে বলল, "গজদা, একটা কিন্তু সমস্যা আছে।

"কী বলো তো ?"

ন্যাড়া মাথা চুলকে বলল, "বাবার ল্যাবরেটরিতে ভূত আছে।"

গজ চমকে উঠে বলে, "ভূত ! তোমরা দেখেছ ?"

ন্যাড়া মাথা নেড়ে বলল, "আমি নিজে দেখিনি। তবে অনেকে দেখেছে।"

"ভূতটার চেহারা কেমন ?"

"সেইটেই তো গোলমেলে। একটা ভূত হলে একই রকম চেহারা হওয়ার কথা। কিন্তু এখানে নানা সময়ে নানাজনে নানারকম ভূতকে দেখে। বেঁটে ভূত, লম্বা ভূত, সাহেব ভূত, কাফ্রি ভূত। ভয়ে রাত-বিরেতে এদিকে কেউ আসে না।"

গজ একটু চিন্তিত হয়ে বলল, "ভূতের ভয় আমার নেই। তবে অনেকে যখন দেখেছে, তখন কিছু একটা আছেই। যাই হোক, আমি সাবধান থাকত।"

"দরজাটা ভাল করে এঁটে শোবেন।"

কাঁচের শার্শি দিয়ে পঞ্চানন্দ সবই মন দিয়ে দেখছিল আর শুনছিল। ভূতের কথাতে তার গায়ে একটু কাঁটা দিল।

ল্যাবরেটরির ভিতরে আলো থাকায় গজ-পালোয়ানকে খুব ভাল করে দেখে নিল পঞ্চানন্দ। চেহারাটা একই রকম আছে। গায়ের জোরও কি আর কমেছে ? ওই হাতের রদ্দা যে কী বিভীষণ তা পঞ্চানন্দের মতো আর কে জানে ?

ন্যাড়া বিদেয় হলে গজ ঘরের দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ বাঘের মতো পায়চারি করল। মাঝে-মাঝে কটমট করে চারদিকে চাইছে। একবার যেন পঞ্চানন্দের দিকেও চাইল।

বাইরে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। পঞ্চানন্দ জানে তাকে গজ পালোয়ান দেখতে পায়নি। তবু সে একটু পিছনে সরে একটা লেবুগাছের আড়ালে দাঁড়াল, চারদিকটায় একটু চোখ বুলিয়ে দেখে নিল। নাঃ, কোথাও কেউ নেই।

গজ পালোয়ান আরও কিছুক্ষণ পায়চারি করে থমকে দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ। তারপর এগিয়ে এসে ঘরের জানালাগুলোর পর্দা ভাল করে টেনে দিতে লাগল।

পর্দাগুলো ভীষণ মোটা কাপড়ের। তার ভিতর দিয়ে কিছুই দেখা যায় না। পঞ্চানন্দ জানালার ধারে গিয়ে অনেক উঁকিঝুঁকি দিল, কিন্তু সুবিধে হল না। তবে এটা সে বুঝল যে, ঘরে আলো জেবলে গজ কিছু একটা করছে। একটা দেরাজ খোলার শব্দ হল। কিছুক্ষণ পর একটা লোহার আলমারির পাল্লার শব্দও পাওয়া গেল।

গজ বন্ধ ঘরে কী করছে তা জানার অদম্য কৌতূহল সত্ত্বেও কিছু করার নেই জেনে পঞ্চানন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরের দিকে রওনা দেওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

আর তার পরেই তার মাথার চুলগুলো দাঁড়িয়ে পড়ার উপক্রম।

কেয়াঝোপটার নীচে ঘুটঘুট্টি ছায়ায় হঠাৎ একটু নড়াচড়া পড়ে গেল যেন। পঞ্চানন্দের চোখে অন্ধকার সয়ে যাওয়ায় একটু ঠাহর করে চাইতেই সে দেখতে পেল, তিনটে মানুষের চেহারার প্রেতমূর্তি কেয়াঝোপের অন্ধকার থেকে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে আসছে।

পঞ্চানন্দ এমন হাঁ হয়ে গেল যে, নড়াচড়ার সাধ্য নেই। পা দুটো যেন পাথর। শরীরটা হিম। দাঁতে দাঁতে আপনা থেকেই ঠকঠক শব্দ হচ্ছে।

কিন্তু বহু ঘাটের জল খেয়ে পঞ্চানন্দ ঠেকে শিখেছে অনেক। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে টক করে ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল। কম্বলের তলায় হাত-পা সব টেনে নিয়ে একেবারে মরা হয়ে রইল সে। শুধু মুখের কাছটা একটু ফাঁক করে চোখ দুটো সজাগ রাখল।

আশ্চর্যের কথা কেয়াঝোপের নীচে তিনটে সাহেবের লাশ পোতা আছে বলে সে নিজেই বলে বেড়িয়েছে। সেই তিনজন যে এমন জলজ্যান্ত হয়ে উঠবে তা জানত কোন্ আহাম্মক।

খুব আস্তে-আস্তে তিনটি মূর্তি ল্যাবরেটরির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তিনজনেরই কালো রং। বেশ ঢ্যাঙা। শরীরও তাগড়াই। অন্ধকারে আর ভাল দেখা গেল না কিছু।

পঞ্চানন্দের বেশ কাছ ঘেঁষেই তিনটে মূর্তি ল্যাবরেটরির দিকে চলে গেল। পঞ্চানন্দ শ্বাস বন্ধ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে কুয়োর পাড় আর কলার ঝোপ পেরিয়ে সোজা জরিবাবুর ঘরে ঢুকে দরজা এঁটে দিল।

জরিবাবু অন্ধকারে কাতর গলায় উঠলেন "বাপ রে। গেছি।"

পঞ্চানন্দ ভড়কে গিয়ে 'আঁ আঁ' করে উঠল। তারপর সামলে নিয়ে একটা শ্বাস ফেলে বলল, "জেগে আছেন নাকি আজ্ঞে?"

জরিবাবু কাঁপা গলায় বললেন, "আপনি কে আজ্ঞে?"

"আজ্ঞে পঞ্চানন্দ।"

"এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?"

পঞ্চানন্দ সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "আর বলবেন না জরিবাবু, পাজিগুলোর সঙ্গে কি আর পারা যায়? আবার জ্বালাতে এসেছিল। তাড়া করে গিয়ে একেবারে গোয়ালঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছি।"

জরিবাবু উঠে বসে আলো জ্বালালেন। তারপর কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, "গোয়ালঘর থেকে তারা ফের বেরিয়ে পড়বে না তো! এতক্ষণ বড় জ্বালাতন করে গেছে।"

পঞ্চানন্দ আঁতকে উঠে বলল, "কে জ্বালাতন করে গেছে?"

জরিবাবু পানের বাটা টেনে কোলের ওপর নিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, "সে তো আপনি ভালই জানেন। ওই যে যাঁদের চোখে দেখা যায় না, অথচ আছেন,

তারাই আর কি। তাও একজন নয়, দুজন নয়, তিন-তিনজন।"

"বলেন কী জরিবাবু! অ্যাঁ?"

"কেন আপনার সঙ্গে তাদের দেখা হয়নি?"

পঞ্চানন্দ কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, হ্যাঁ, তা,—তা হয়েছে বইকী। তবে কিনা …ইয়ে…।"

"আর বলবেন না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে শুনি ঘরে খুটখাট শব্দ। আমার ঘরে বাদ্যযন্ত্রের অভাব নেই। শুনি, পিড়িং করে তানপুরা বেজে ওঠে, টুস্ করে তবলায় শব্দ হয়, জ্যাঁ করে হারমোনিয়ামের আওয়াজ ছাড়ে। ওফ, কতক্ষণ দম চেপে শুয়ে ছিলাম।"

পঞ্চানন্দ তার বিছানাটা জরিবাবুর চৌকির ধারে টেনে এনে বলল, "আর ভয় নেই। আমি কাছাকাছি রইলাম। একটা জব্বর পান সাজুন তো।"

পনেরো

জরিবাবু উঠে পান সাজতে বসলেন। কম্বল মুড়ি দিয়ে পঞ্চানন্দ হিহি করে কাঁপছিল। জরিবাবু বললেন, "আপনার কি খুব শীত লেগেছে পঞ্চানন্দবাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। বেজায় শীত।"

"কিন্তু কই ঘরের মধ্যে তো তেমন ঠাণ্ডা নেই?"

পঞ্চানন্দ বিরক্ত হয়ে বলল, "আমার ম্যালেরিয়ার ধাত। যখন-তখন শীত করে।"

"হিমালয়ে করত না?"

পঞ্চানন্দ কম্বল দিয়ে ভাল করে মাথাটা ঢেকে বলল, "করত। আবার যোগবলে শীত তাড়িয়েও দিতাম। তা ইয়ে, ঘরে কারা ঢুকেছিল বলেছিলেন যে?

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তাদের তো আপনিও দেখেছেন।"

"তবু শুনি বৃত্তান্তটা।"

জরিবাবু একটা পানের খিলি পঞ্চানন্দকে এগিয়ে দিয়ে নিজেও একটা মুখে পুরলেন। তারপর নিমীলিতচক্ষু হয়ে কিছুক্ষণ চিবিয়ে বললেন, "প্রথমটায় ভেবেছিলাম আপনি বোধহয় কিছু খুঁজছেন।"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলল, "এ ঘরে খোঁজার আছেটাই বা কী বলুন। যত সব অকাজের বাদ্যযন্ত্র, নীচের দেরাজের টানায় বাহান্নটা টাকা, তোশকের তলায় তিন টাকার খুচরো আর আলমারিতে উঁচু তাকে ধুতি-পাঞ্জাবির ভাঁজের মধ্যে লুকোনো একটা সোনার বোতাম আর গুটিকয় আংটি। আরও কিছু আছে বটে, তবে কিবা ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে আর কে চায় বলুন।

জরিবাবু চোখদুটোকে একেবারে রসগোল্লা বানিয়ে বাক্যহারা হয়ে চেয়ে থাকলেন পঞ্চানন্দের দিকে। তারপর অতিকষ্টে গলার স্বর খুঁজে পেয়ে বললেন

"দেরাজের টাকা, তোশকের তলা এ নাহয় বুঝলুম খুঁজেপাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু আলমারির ভিতরের জিনিসের সন্ধান পেলেন কী করে ? ওটা যে চব্বিশ ঘণ্টা চাবি দেওয়া থাকে। আর চাবি বাঁধা থাকে আমার কোমরের ঘুনসিতে !"

পঞ্চানন্দ উঠে জানালা সাবধানে ফাঁক করে পানের পিক ফেলে আবার পাল্লা দুটো এঁটে ফিরে এসে হেঁহেঁ করে লাজুক একটু হাসি হাসল, তারপর দরজার ওপরকার তাকে সরস্বতী মূর্তিটার দিকে উদাস নয়নে চেয়ে থেকে বলল, "শিবুবাবুও বলতেন, 'ওরে পঞ্চানন্দ, তোর চোখ যে দেয়াল ফুঁড়ে দেখতে পায়।' একবার হল কী জানেন, শিবুবাবুর সঙ্গে সকালে বেড়াতে বেরিয়েছি, গুঁইদের বাড়ির পিছনে একটা মস্ত পোড়ো মাঠ ছিল তখন। সেখানে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ শিবুবাবুর পা আটকে গেল এক জায়গায়। কিছুতেই নড়তে পারেন না, ভয় খেয়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'ওরে পঞ্চানন্দ, এ কী অলক্ষুনে কান্ড দ্যাখ। পা দুটো যে একেবারে খাটের পায়া হয়ে গেল, নট নড়ন চড়ন, এ কী কাণ্ড রে বাবা !' আমি গিয়ে কাণ্ড দেখে খুব হাসলুম, তারপর বললুম, 'আজ্ঞে পায়ের দোষ নেই, দোষ জুতোর, বিহারি নাগরা পরে বেরিয়েছেন, নাগরার নীচে বুলাকি আর নাল লাগানো। লোহার জিনিস চুম্বকে তো আটকাবেই।' উনি তো আকাশ থেকে পড়লেন। 'চুম্বক ! চুম্বক কোথায় ?' আমি খুব হেসে-টেসে বললাম, 'আজ্ঞে মাটির সাত হাত নীচে।' পরে লোক ডেকে মাটি খুঁড়িয়ে সাত হাত নীচের থেকে সাত মন ওজনের এক চুম্বক তোলা হল। তাই বলছিলাম—"

জরিবাবু এত অবাক হয়ে গেছেন যে, ভুলে জর্দার রস সমেত পানের পিক গিলে ফেলে হেঁচকি তুলতে লাগলেন। শুধু স্খলিত কণ্ঠে বললেন, "আপনি লোহার আলমারির ভিতরটা দেখতে পান ?"

"দিনের মতো। ওই তো দেখা যাচ্ছে, নীচের তাকে আপনার মুগার পাঞ্জাবি আর আলিগড় পায়জামা, দ্বিতীয় তাকের কোণের দিকে সেন্টের শিশির গোলাপজলের ঝারি, পমেটম। ওপরের তাকে—"

"থাক থাক। ওতেই হবে।"

পঞ্চানন্দ খুব আরামে পান চিবোতে-চিবোতে বলল, "শেষ দিকটায় তো এমন হয়েছিল যে, গ্রহ-নক্ষত্রের কোথায় কী হচ্ছে তা আর শিবুবাবুকে আঁক কষে বা দূরবিন দিয়ে দেখতে হত না। আমিই বলে দিতাম। সব ঠিকঠাক লেগেও যেত। সাধনায় কী না হয় বলুন ! আপনার গলাতেও তো সাধনাতেই গান ফুটল !"

জরিবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "তা বটে।"

"অথচ শিবুবাবু প্রায়ই বলতেন, "ওরে পঞ্চানন্দ, আমার জরিটার গলা শুনেছিস ? ঠিক যেন ব্যাঙ ডাকছে।"

"বাবা বলতেন ও-কথা ?"

পঞ্চানন্দ মিটমিট হেসে বলল, "তা সত্যি বলতে কী জরিবাবু, আপনাকে

এই এতটুকু দেখেছি। তখন আপনার গলা দিয়ে সাতরকম স্বর বেরোত একসঙ্গে। ওফ্, ও-রকম বিকট আওয়াজ আর শুনিনি। তা সে-কথা যাক। এখন আপনার গলার অনেক চেকনাই এসে গেছে। ধরবেন নাকি একখানা দরবারি কানাড়া? মেজাজ না থাকলে মালকোশই হোক। তবে তার আগে কথাটা শেষ করুন।"

জরিবাবু কিছুক্ষণ থম ধরে থেকে বললেন, "হাঁ, প্রথমটায় ভেবেছিলাম আপনি কিছু খুঁজছেন। তাই বিশেষ গা করলাম না। পরে ভাবলাম, আপনি হয়তো অন্ধকারে পানের বাটাটাই খুঁজে মরছেন। তাই বললাম, 'পঞ্চানন্দবাবু, পানের বাটা খাটের তলায়।' যেই-না বলা অমনি দেখি একটা কালো মূর্তি শাঁ করে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। পিছনে আরও দুটো।"

পঞ্চানন্দ জরিবাবুর খাটের সঙ্গে আরও ঘেঁষে বসে অমায়িক হাসি হেসে বলল, "পঞ্চানন্দর নাম করলেই কেন যে আজও এরা এত ভয় পায়! আমি সন্ন্যাসী বৈরাগী মানুষ, কারও কোনও ক্ষতি করি না, তবু নামটি করে দেখুন চোর-ডাকাত ভূত-প্রেত গুণ্ডা-বদমাস সব পড়ি-কি-মরি করে পালাচ্ছে।"

জরিবাবু ঘনঘন হিক্কা তুলতে তুলতে বললেন, "আপনি আছেন বলেই আমার ভরসা আছে। কিন্তু সেই সময়টায় আপনি যে কোথায় গিয়েছিলেন।"

পঞ্চানন্দ গম্ভীর হয়ে বলল, "একজনকে নিয়ে থাকলে তো আমার চলবে না জরিবাবু। এখন গোটা বাড়িটারই দেখাশোনার ভার আমার ওপর। শুধু কি তাই? কর্তাবাবু আর গিন্নিমা আজ আমার কাঁধে আরও এক গন্ধমাদন চাপিয়ে দিলেন। কাল থেকে আমি হব কর্তাবাবুর সেক্রেটারিকে সেক্রেটারি, আবার ম্যানেজারকে ম্যানেজার। পাগল-ছাগল নিয়েই জীবনটা কেটে গেল।"

জরিবাবুর চোখ আবার রসগোল্লা। বললেন, "অপানি দাদার সেক্রেটারি? দাদার আবার সেক্রেটারির কী দরকার?"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে রহস্যময় একটু হেসে বলল, "আছে আছে। চিরদিন কি আর হরিবাবুর একই রকম যাবে? তাঁর কপাল ফিরল বলে। তখন লাখে-লাখে টাকা, তাল-তাল সোনা আর হাজার রকমের বিষয়-সম্পত্তি সামলাবে কে?"

জরিবাবুর মুখ এমন হাঁ হয়ে রইল যে, একটা মশা তার মধ্যে সাতবার সিঁধিয়ে সাতবার বেরিয়ে এল। জরিবাবু ভুল করে ফের জর্দাসুদ্ধু পানের পিক গিলে বিকট হেঁচকি তুলে বললেন, "বলেন কী! দাদা এসব পাবে কোত্থেকে?"

পঞ্চানন্দ বিজ্ঞের মতো মুখের ভাব করে বলল, "আকাশ থেকে নয় জরিবাবু। কেন, আপনাকে সেই চাবি আর তার সঙ্কেতের কথা বলিনি নাকি?"

জরিবাবু মাথা চুলকে বললেন, "বললেও মনে পড়ছে না। সারাদিন আপনি এত হরেকরকম কথা বলেছেন যে, তার মধ্যে কোন্‌টা রাখব কোনটা ছাড়ব তা

ঠিক করতে পারিনি।"

পঞ্চানন্দ হেসে বলল, "তা বটে। আমি একটু বেশি কথা বলই ঠিকই। তবে বিশ বছর টানা মৌন থাকার পর কথা তো একটু বেরোবেই।"

"চাবির কথা কী যেন বলছিলেন!"

"হ্যাঁ। চাবিটাকে শিবুবাবুই দিয়েছিলেন। বেশ ভারী চাবি। শিবুবাবুর অবস্থা তখন বেশ বিপজ্জনক। কারা যেন সব আসে যায়। কী সব বদ মতলব নিয়ে কারা যেন ঘোরা ফেরা করে। শিবুবাবু সব কথা আমার কাছে ভাঙতেন না। তবে এক সন্ধেবেলায় আমাকে ডেকে চুপিচুপি বললেন, 'পঞ্চানন্দ, গতিক সুবিধের নয় রে। এবার বুঝি মারা পড়ি। কী কুক্ষণে বিজ্ঞান নিয়ে কাজে নেমেছিলাম, তার ফল এখন ভোগ করতে হচ্ছে।"

জরিবাবু সোৎসাহে বললেন, "বাবা বোধহয় নতুন কিছু আবিষ্কার করেছিলেন? আর তার ফরমুলা বাগাতেই…,'

পঞ্চানন্দ কথা ফুঁ দিয়ে কথাটা উড়িয়ে বলল, "আবিষ্কার! সে তো উনি আকছার করতেন। এই যে ব্যাটারা চাঁদে মানুষ নামিয়ে খুব হাঁকডাক ফেলে দিয়ে বাহবা কুড়োচ্ছে, কেউ কি জানে যে, ওই রকেটের ন্যাজের কাছে তিনটে খুব ঘোড়েল স্ক্রু এই আমাদের শিবুবাবুর তৈরি? ওই তিনটে স্ক্রু না পেলে চাঁদে যাওয়া বেরিয়ে যেত। তিনহাত উঠতে না উঠতেই ধপাস করে পড়ে যেত রকেট। তারপর ধরুন না, ওই যে অ্যাটম বোমা, সেটার মশলার কথা কজন জানে? ব্যাটারা বোমা বানিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা শত চেষ্টা করেও আর ফাটাতে পারে না। শিবুবাবু গিয়ে কি করলেন জানেন? স্রেফ এক-চিমটি হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়ে এলেন তাতে। আর অমনি সেই বোমা একেবারে ফটফাটং ফট।"

"বটে?"

"তবে আর বলছি কী? জাপানিরা দিব্যি ট্রানজিস্টর ছেড়েছে বাজারে। স্বীকার করবে না, তবু বলি, একদিন বিকেলে কুচো-নিমকি খেতে খেতে হঠাৎ করে ট্রানজিস্টর তৈরির ফিকিরটা মাথায় খেলে গেল শিবুবাবুর। সেইটে নিয়ে আজ জাপানের কত রম-রমা।"

"এসব তো আমরা জানতামও না।"

"আমিই কি সব জানি? তবে রোজই দু'চারটে করে জিনিস তিনি আবিষ্কার করে ফেলতেন। আর তাই নিয়েই তো গণ্ডগোল।"

জরিবাবু পানের পিক আবার ভুল করে গিলে ফেললেন। বললেন, "তারপর?"

"শিবুবাবু চাবিটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'কবে খুন হয়ে যাই তার তো ঠিক নেই। এই চাবিটা রাখ। আমার ছেলেগুলো এখনও নাবালক। তুই চাবি নিয়ে হিমালয়ে পালিয়ে যা। কেউ যেন তোর খোঁজ না পায়। আমার ছেলেরা বড় হলে ফিরে এসে চাবিটা দিস, আর বলিস, ঈশান কোণ,

তিন ক্রোশ।"

জরিবাবুর মুখের মধ্যে ঢুকে মশাটা বার কয়েক চক্কর দিয়ে ফিরে এল। বোধহয় জর্দার কড়া গন্ধ সইতে পারল না। জরিবাবু বললেন, "কথাটার মানে কী?"

"আজ্ঞে তা কে জানে? তবে মানে একটা আছে এটা ঠিক। আর চাবিটা বড় আজেবাজে জিনিস নয়।"

"ঈশান কোণ তিন ক্রোশ তো? তা হলে জায়গাটা খুঁজতে কোনও অসুবিধেই তো হবে না।"

"হওয়ার কথা নয়।" বলে পঞ্চানন্দ হাসল।

ষোলো

ভোর না হতেই ন্যাড়া উঠে পড়ল। রাতে ভাল ঘুমও হয়নি তার। সে কুস্তিগির হলেও নানারকম ভয়ডর তার আছে। গায়ে জোর থাকলেও মনের জোর অন্য জিনিস। পঞ্চানন্দ নামে যে রহস্যময় লোকটি তাদের বাড়িতে থানা গেড়েছে, সে একদফা ভয় দেখিয়ে ভড়কে দিয়ে গেছে তাকে। তার ওপর মাঝরাতে গজ-পালোয়ানের আবির্ভাব তাকে আরও দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

দরজা খুলে ন্যাড়া সোজা গিয়ে ল্যাবরেটরির দরজায় ধাক্কা দিল, "ও গজদা, দরজা খুলুন।"

দরজা প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই খুলে গেল এবং ন্যাড়া অবাক হয়ে দেখল, গজদার বদলে পঞ্চানন্দ। মুখে একগাল হাসি।

ন্যাড়া থতমত খেয়ে বলল, "আপনি এখানে?"

পঞ্চানন্দ মাথা চুলকে বলল, "আজ্ঞে, সব দিকে নজর রাখাই আমার অভ্যাস কিনা। ভোর রাতে কে যেন কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'দাদা, উঠুন, শিবুবাবুর ল্যাবরেটরিতে কুরুক্ষেত্র হচ্ছে।' শুনেই চটকা ভেঙে গেল।"

ন্যাড়া বিবর্ণ মুখে বলল, "কে বলে গেল কথাটা?"

হেঃ হেঃ করে মাথা চুলকোতে-চুলকোতে একটু হাসল পঞ্চানন্দ, "আজ্ঞে, সকল গুহ্য কথা কি ফাঁস করা যায়? তবে আমার চর-টর আছে। সাদা চোখে তাদের দেখা যায় না। তা সে যাকগে। খবর পেয়েই এসে হাজির হয়ে যা দেখলাম তাতে চোখ ছানাবড়া।"

"কী দেখলেন?"

"তিনটে সাহেবের সঙ্গে গজ-পালোয়ানের একেবারে গজকচ্ছপ হচ্ছে। চারদিক একেবারে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। তারপর তিনজনে মিলে গজ-পালোয়ানকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল।"

"বলেন কী!"

"তবে আর বলছি কী? এই এতক্ষণ ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ল্যাবরেটরিটা আবার যেমনকে তেমন গুছিয়ে রাখলাম আর কি। কিন্তু একটা ধন্ধ আমার কিছুতেই যাচ্ছে না। গজ-পালোয়ান লোকটা কেমন বলুন তো!"

ন্যাড়া মিনমিন করে বলল, "ভালই তো। কারও সাতে-পাঁচে থাকেন না।"

"তবে রাত্তিরে শিবুবাবুর ল্যাবরেটরিতে এসে তার সেঁধোনোর মানে কী?"

ন্যাড়া আমতা-আমতা করে বলল, গজদা একটু অসুবিধেয় পড়ে এসেছিলেন, তাই আমিই তাঁকে এখানে থাকতে বলেছিলাম মাঝরাতে।"

শুনে পঞ্চানন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে খুব স্থির দৃষ্টিতে গম্ভীর মুখে ন্যাড়ার দিকে চেয়ে থেকে বলল, "কাজটা খুব ভাল করেননি ছোটবাবু। শিবুবাবুর ল্যাবরেটরিতে অনেক দামি জিনিস আছে। এসব জিনিসের দাম টাকায় হয় না। তার ওপর গজ-পালোয়ানের আপনি কতটুকুই বা জানেন?"

দুষ্টু ছেলে যেমন দুষ্টুমি ধরা পড়ায় কাঁচুমাচু হয়ে পড়ে, তেমনি মুখ করে ন্যাড়া বলল, "গজদা লোক তো বেশ ভালই।"

পঞ্চানন্দ মাথাটা দু'পাশে নেড়ে মুখে চুকচুক একটা শব্দ করে বলল, "তাই যদি হবে তো তিনটে শহরের পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে কেন? কেনই বা তার মাথার দাম দশ হাজার টাকায় উঠেছিল?"

ন্যাড়ার মুখে কিছুক্ষণ কথা সরল না। তারপর অনেকক্ষণ বাদে সে শুধু বলল, "ফঁত।"

পঞ্চানন্দ জানে 'ফঁত' কথাটার কোনও মানে হয় না, এটা বাংলা বা ইংরিজি বা হিন্দি কোনও ভাষাও নেই। এটা হল ভয় বিস্ময় ঘাবড়ে-যাওয়া মেশানো একটা শব্দমাত্র। অর্থাৎ ন্যাড়া বাক্যহারা।

পঞ্চানন্দ একটু মোলায়েম হয়ে বলল, "অবিশ্যি সে-সব কথা আর না তোলাই ভাল। গজ-পালোয়ান যদি ফিরেও আসে তবু তার কাছে সে-সব কথা খবরদার তুলবেন না। লোকটা একে রাগী, তার ওপর ভয়ংকর গুণ্ডা। চাই কি আপনাকেই দুটো রদ্দা বসিয়ে দিল।

ন্যাড়া বাক্য ফিরে পেয়ে ঘাড় নেড়ে বলল, "না, বলব না।"

পঞ্চানন্দ ল্যাবরেটরির দরজায় একটা ভারী তালা লাগিয়ে চাবিটা নিজের ট্যাঁকে গুঁজে বলল, "কথা আর পাঁচ-কান করবেন না। গজ-পালোয়ান যে এখানে রাতে থানা গেড়েছিল, তাও বেমালুম ভুলে যান। মনে করবেন স্বপ্ন দেখেছিলেন।"

ন্যাড়া বিষণ্ন মুখে ঘাড় নেড়ে বলল, "আচ্ছা।"

ন্যাড়াকে বিদায় করে পঞ্চানন্দ চারদিকটা একটু ঘুরে দেখল। বেশ মোলায়েম রোদ উঠেছে। ঘাসে শিশির ঝলমল করছে। গাছে পাখি ডাকছে।

কুয়োতলায় একডাঁই বাসন মাজতে বসেছে ঠিকে-লোক। পঞ্চানন্দ গিয়ে তার সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "বুঝেসুঝে কাজ কোরো বাপু, বাসনে যেন ছাইয়ের দাগ না থাকে। আমি হলাম এ-বাড়ির নতুন ম্যানেজার। কাজে গাফিলতি সইতে পারি না, দু'দশ টাকা মইনে বেশি চাও, তা সে দেখা যাবে।"

কাজের লোক বিগলিত হয়ে গেল।

হরিবাবু বাজার করতে পছন্দ করেন না। কিন্তু বাজার তবু তাঁকেই করতে হয়। কারণ, জরিবাবু বাজারে গেলে রেওয়াজে বাধা পড়ে, ন্যাড়া বাজারে গেলে কুস্তিতে ফাঁক পড়ে। ঘড়ি আর আংটির পড়াশুনো আছে। তাই কবি হরিবাবুকে রোজ সাতসকালে বাজার করার মতো অকাব্যিক কাজ করতে হয়।

আজও হরিবাবু বাজার করতে বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। গিন্নি বাজারের ফর্দ করে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে রোজকার মতোই মনে করিয়ে দিলেন, "প্রত্যেকটা আইটেম কিনে তার কত দাম দিলে তা পাশে লিখে নেবে।"

হরিবাবু তা রোজই লেখেন, তবু ফিরে এলে দেখা যায় দু'চার টাকার গোলমাল ওর মধ্যেই করে ফেলেছেন। মুশকিল হল, অঙ্কে তিনি বরাবরই কাঁচা। সাড়ে তিন টাকা কিলোর জিনিস সাড়ে তিনশো গ্রাম কিনলে কত দাম হয় সেটা টক করে তাঁর মাথায় খেলে না। রোজই তাই বাজার থেকে এসে তাঁকে নানা জবাবদিহি করতে হয়।

আজ বেরোবার মুখেই দেখেন পঞ্চানন্দ ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে জমাদারকে রীতিমত দাবড়াচ্ছে, "বলি ঝাড়ু দিস তা তোর ঝ্যাঁটার শব্দ শোনা যায় না কেন রে? ওরকম ফাঁকির কাজ আর দেখলে একেবারে বিদেয় করে দেব। বাবু ভালমানুষ বলে খুব পেয়ে বসেছ দেখছি। দু'পাঁচ টাকা বাড়তি চাও পাবে, কিন্তু কাজ চাই একদম ফার্স্ট ক্লাস।"

হরিবাবু খুশিই হলেন। কাজের লোকগুলো বেজায় ফাঁকিবাজ তা তিনি জানেন, কিন্তু যথেষ্ট দাবড়াতে পারেন না। দাবড়ানোর জন্য যে-সব ভাষা এবং স্পষ্ট কথার প্রয়োজন তা তাঁর আসে না। তাঁর মগজে যে-সব ভাষা খেলা করে, তা কবিতার ভাষা। সে-ভাষায় জমাদার বা কাজের লোককে দাবড়ানো যায় না।

তিনি পঞ্চানন্দের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "বাঃ, এই তো চাই।"

পঞ্চানন্দ বিগলিতভাবে বলল, "কবি মানুষের কি বাজার করা সাজে! ছিঃ ছিঃ, দিন ও-সব ছোট কাজ আর আপনাকে করতে হবে না। ও আমিই বুঝেসুঝে করে আনব'খন।"

হরিবাবু খুশি হলেও ঘাড় চুলকে বললেন, "মুশকিল কী জানো, এটা শুধু বাজার করাই তো নয়, মর্নিং ওয়াক, অঙ্ক শিক্ষা, বাস্তব জ্ঞান অর্জন, সবই একসঙ্গে। তাই গিন্নি যদি শোনেন যে, আমার বদলে তুমি বাজারে

গেছ, তা হলে কুরুক্ষেত্র করে ছাড়বেন।"

এ-কথাটায় পঞ্চানন্দও একটু ভাবিত হল। বস্তুত এ-বাড়ির গিন্নিমাকেই সে একটু ভয় খাচ্ছে। তাই চাপা গলায় বলল, "তা হলে আপনিও-না হয় চলুন। বাজারের কাছে মাঠের ধারে গাছতলায় বসে আকাশ-পাতাল যা হোক ভাবতে থাকুন, আমি ধাঁ করে বাজার এনে ফেলব। গিন্নিমাকে কথাটা না ভাঙলেই হল।"

হরিবাবু তবু সন্দিহান হয়ে বলেন, "হিসেব-টিসেব সব ঠিকমতো দিতে পারবে তো?"

পঞ্চানন্দ একগাল হেসে বলল, "হিসেবে তেমন গোলমাল আমার হয় না। তবে কিনা আমি লোকটা তো তেমন সুবিধের নয়। দু'চার টাকা এধার-ওধার হয়েই যাবে, যেমন আপনারও হয়। তবে হিসেব এমন মিলিয়ে দেব যে, গিন্নিমা টুঁ শব্দটিও করতে পারবেন না। শিবুবাবুও আমাকে দিয়ে মেলা বাজার করিয়েছেন।"

হরিবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "তাই নাকি?"

"একেবারে আপনভোলা লোক ছিলেন তো, ডান বাঁ জ্ঞান থাকত না, প্রায়ই। মাথায় নানারকম আগড়ম-বাগড়ম আজগুবি চিন্তা নিয়ে ঘুরে বেড়ালে যা হয় আর কি। আমি তাঁকেও ওই মাঠের ধারে গাছতলায় বসিয়ে রেখে বাজার করে আসতাম। এসে দেখতাম বসে-বসে ছোট্ট একখানা খাতায় মেলা আঁক কষে ফেলেছেন।"

"বটে!"

"কাল থেকে আপনিও একখানা ও-রকম খাতা সঙ্গে করে আনবেন। গাছতলায় বসলে ভাব আসবে, পদ্যও লেখা হয়ে যাবে ঝুড়ি-ঝুড়ি।"

হরিবাবু পঞ্চানন্দের সঙ্গে বাজারের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "শুধু লিখলেই তো হল না হে। সেটা ছাপাও তো দরকার।"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলল, "খুব ন্যায্য কথা। ভাল জিনিসের আজকাল কদরই বা করে কে। আমাদের গাঁয়ের শ্রীপতি কবিয়াল তো হন্যে হয়ে উঠেছিল। পদ্য লিখে পোস্টার সাঁটত দেয়ালে, পদ্য লেখা কাগজের ঠোঙা বিলি করত দোকানে দোকানে, তারপর এক ঘুড়িওলাকে ধরে পদ্য ছাপানো কাগজের ঘুড়ি তৈরি করে গাদা-গাদা বিলোল। তাতে কাজও হল ভাল। লোকে পোস্টারে কবিতা পড়তে শুরু করল। মুড়ি খেয়ে ঠোঙাটা ফেলে দেওয়ার আগে অনেকেই ঠোঙার গায়ের লেখা একটু পড়ে দেখে। তেমনি শ্রীপতির কবিতাও পড়তে লাগল। তারপর ধরুন ঘুড়ির পদ্যও তো এক আজব জিনিস। যে ঘুড়ি কেনে সে পড়ে, তারপর ঘুড়ি কাটা গেলে আর একজন ধরে, তখন সে পড়ে। এমনি করে সাতটা গাঁ আর তিনটে শহরে শ্রীপতি রীতিমত শোরগোল তুলে ফেলল।"

হরিবাবু যেন একটু উৎসাহী হয়ে উঠলেন। বললেন, "ব্যাপারটা একটু

ছেলেমানুষি বটে, কিন্তু আইডিয়াটা বেশ নতুন তো।"

"তবে আর বলছি কী। দুনিয়ার নতুন কিছু করতে পারলেই কেল্লা ফতে। তবে একটু খরচ আছে।"

সতেরো

পঞ্চানন্দ যখন বাজার করে ঘরে এল তখনও হরিবাবু মাঠের ধারে বাঁধানো গাছতলায় বসে খুব কষে ভাবছেন, কবিতা লেখা ঘুড়ি ক'ডজন ছাপানো যায় এবং কবিতার ঠোঙা তিনি কীরকম কাগজ দিয়ে তৈরি করাবেন। ভাবতে-ভাবতে তন্ময় হয়ে গেছেন। একটা নেড়ি কুকুর এসে তাঁর গা শুঁকে অনেকক্ষণ ল্যাজ নাড়ল, তারপর তাঁর একপাটি চটি মুখে নিয়ে চলে গেল। তিনি টেরও পেলেন না।

পঞ্চানন্দ এসে এই অবস্থা দেখে প্রথমে গলাখাঁকারি দিল। তাতে কাজ না হওয়ায় দু'বার "হরিবাবু, ও হরিবাবু" বলে ডাকল। এবং অপারগ হয়ে শেষে ধাক্কা দিয়ে হরিবাবুকে সচেতন করে বলল, "বাজার হয়ে গেছে। একেবারে কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব মিলিয়ে এনেছি। গিন্নিমা'র ফর্দের মধ্যে দামটাও টুকে দিয়েছি।"

হরিবাবু এইসব তুচ্ছ ব্যাপারে গা করলেন না। এমনই তাঁর অন্যমনস্কতা যে, উঠে একপাটি চটি পায়ে দিয়ে আর একপাটির জন্য পা বাড়িয়ে যখন সেটা পেলেন না, তখনও তাঁর তেমন অস্বাভাবিক কিছু মনে হল না। মনে হল, একপাটি চটি পায়ে দেওয়াই তো রেওয়াজ। সুতরাং একটা খালি পা আর একটা চটি-পায়ে পঞ্চানন্দের পাশে-পাশে হাঁটতে-হাঁটতে তিনি বললেন, "দ্যাখো পঞ্চানন্দ, ঠোঙা ঘুড়ি এসব ভাল বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে আরও কয়েকটা ব্যাপারও আমার মাথায় এসেছে। ধরো, স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের যদি বিনা পয়সায় খাতা বিলোনো যায়, আর সেই খাতার মলাটের চার পিঠে চারটে কবিতা ছাপিয়ে দিই তো কাজটা অনেকটা দূর এগোয়। বছরের শুরুতে আমরা কবিতা-ছাপানো ক্যালেণ্ডার বের করতে পারি। তারপর হোমিওপ্যাথ ডাক্তারদের ধরে পড়লে তারা যে পুরিয়া করে ওষুধ দেয় সেই পুরিয়ার কাগজে ছোট-ছোট কবিতা ছাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে।"

পঞ্চানন্দ বলল, "খাসা হবে। ওষুধের উপকার, কবিতার উপকার, দুই একসঙ্গে। এরকম আরও ভাবতে থাকুন। আমাদের হরিদাস কবিয়াল তো দিনে পাঁচ-সাতখানা করে খাম পোস্টকার্ড পাঠাত নানা লোককে।"

হরিবাবু হতচকিত হয়ে বললেন, "খাম পোস্টকার্ড?"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলল, "বুঝলেন না, সে কি আর সত্যিকারের চিঠি নাকি? সব কবিতায় ঠাসা। চিঠি ভেবে লোকে খুলে দেখত কবিতা। ওইভাবেই তো হরিদাস একেবারে ঝড় তুলে দিয়েছিল।"

হরিবাবু উত্তেজিত গলায় বলল, "তুমি আজই কয়েকশো খাম আর

পোস্টকার্ড নিয়ে এসো।"

পঞ্চানন্দ উদার গলায় বলল, "হবে হবে, সব হবে। পঞ্চানন্দ যখন এসে পড়েছে তখন আর আপনার ভাবনা কী? কিন্তু হরিবাবু, আপনার ডান পায়ের চটিটা যেন দেখছি না!"

হরিবাবুও তাকিয়ে দেখতে পেলেন না। কিন্তু তেমন অবাকও হলেন না। বললেন, "চটি জিনিসটাই বাজে। কখনও একটা পাই না, কখনও দুটোই পাই না।" বলে বাঁ পায়ের চটিটা ছুঁড়ে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে খালি পায়ে ডগমগ হয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, "আচ্ছা, ধরো, যদি কবিতা দিয়ে নামাবলী ছাপিয়ে বিলি করি, তা হলে কেমন হয়?"

"ভেবে দেখার মতো কথা বলেছেন। খুবই ভেবে দেখার মতো কথা। তবে কিনা গিন্নিমা দোতলা থেকে এদিকে নজর রেখেছেন। বাজারের থলিটা এইবেলা হাতে নিয়ে ফেলুন। আমি বরং পিছন দিক দিয়ে ঘুরে যাচ্ছি।"

তা সত্যিই হরিবাবুর স্ত্রী দোতলা থেকে নজর রাখছিলেন। হরিবাবু বাড়ি ঢুকতেই তিনি ধেয়ে এসে তাঁর সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন।

হরিবাবু পকেট থেকে ফর্দটা পট করে বের করে এনে একগাল হেসে বললেন, "আজ দ্যাখো, হিসেব একেবারে টু দি পাই মিলিয়ে এনেছি।"

তাঁর গিন্নি কঠোর গলায় বললেন, "হিসেব পরে হবে, আগে বলো, পায়ের চটি-জোড়া কোথায় জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছ!"

হরিবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, "চটি! চটি পরে আমি বাজারে যাইনি তো।"

"চটি পরে যাওনি মানে? তবে কি বুট পরে গিয়েছিলে?"

দু'দিন পঞ্চানন্দের সঙ্গে মিশে হরিবাবুর বুদ্ধি বেশ খুলে গেছে। একগাল হেসে বললেন, "আরে না। খালি পায়েই গিয়েছিলাম। আজকাল ডাক্তারদের মত হচ্ছে, যত আর্থ কন্টাক্ট হয় ততই ভাল। তাতে চোখের জ্যোতি বাড়ে, ব্লাডপ্রেশার হয় না, মাথায় নানারকম ভাব খেলে।"

তাঁর গিন্নি কথাটা বিশ্বাস করলেন না বটে, কিন্তু বেশি ঝামেলাও করলেন না। অফিসের সময় হয়ে আসছে। রান্নায় এ সময় কিছু তাড়া থাকে। শুধু বললেন, "আচ্ছা এ নিয়ে পরে বোঝাপড়া হবে।"

হরিবাবু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। জামা ছেড়ে ছাদে উঠে রোদে বসে তেল মাখতে লাগলেন গায়ে। মাখতে-মাখতে তাঁর ভাব এল। তেলমাখা গায়েই তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে টেবিলে বসে খাতা আর কলম টেনে নিলেন। লিখলেন:

পৃথিবীর গূঢ় অর্থ রয়েছে গোপন,
তেল যথা বুকে সরিষার।
ঘানির গোপন রন্ধ্রে তীব্র নিষ্পেষণে
শুরু হয় তার অভিসার।

কবির হৃদয় আজ ঘানিগাছ হয়ে
নিষ্পেষণ করে পৃথিবীরে,
সত্যের অমল মুখ আজি এ কবিরে
দেখা দিবি কি রে ?

ওদিকে পঞ্চানন্দ বাড়ির পিছন দিকে একটু আড়ালে পড়েই হন্‌হন্‌ করে হাঁটা দিল। বড় রাস্তা বা লোক-চলাচলের জায়গাগুলো সাবধানে এড়িয়ে সে একটু ঘুরপথেই শহরের বাইরে এসে পড়ল দেখতে-না দেখতেই। তারপর একটু পতিত জমি আর একটা মজা পুকুর পার হয়ে জঙ্গুলে রাস্তা ভেঙে এসে উঠল চকসাহেবের বাড়ির হাতায়।

বাইরে থেকে খুব ভাল করে বাড়িটা আর তার আশপাশ দেখে নিল সে। কোথাও কোনও নড়াচড়া নজরে পড়ল না। আগাছায় ভরা বাগানের মাঝখানে ভাঙা বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ধারেকাছে জনবসতি নেই।

পঞ্চানন্দ সাবধানে ভিতরে ঢুকল এবং ঝোপঝাড়ের আড়ালে যতদূর সম্ভব আত্মগোপন করে এগোতে লাগল।

দিনের বেলায় ভাঙা বাড়িটাকে যেমন করুণ দেখাচ্ছে, রাতের বেলায় তেমনি ভয়াবহ মনে হবে। এসব বাড়িতে সাপ আর ভূত গিজগিজ করে।

পঞ্চানন্দ চোর-পায়ে বারান্দাটা পেরিয়ে দরজা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল। না, গজ-পালোয়ানের ঘরে কেউ নেই। জিনিসপত্রগুলো সব লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে বটে। কেউ কিছু একটা খুব খুঁজেছে। কী খুঁজেছে সেটাই জানা দরকার।

পঞ্চানন্দ ভিতরে ঢুকে চারপাশটা পাঁতি-পাঁতি করে দেখল। তার চোখে তেমন কিছু সূত্র নজরে পড়ল না।

দরজার কাছে মেঝের ওপরটা খুব ভাল করে দেখল পঞ্চানন্দ। মেঝেতে লালমতো দাগ রয়েছে খানিকটা। কিন্তু পঞ্চানন্দ চোখ বুজে বলে দিতে পারে ওটা কিছুতেই রক্তের দাগ নয়। রক্ত হলে এতক্ষণ মাছি ভ্যানভ্যান করত। জায়গাটা লাল না হয়ে কালচে দেখাত।

পঞ্চানন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভিতরের দরজা দিয়ে সাবধানে ভাঙা বাড়ির ভিতরে ঢুকল। দেখার মতো তেমন কিছু নেই। রাশি-রাশি ইঁটের স্তূপ, কড়ি-বরগা হেলে পড়ে আছে, থাম পড়ে আছে মেঝের ওপর, আগাছা জন্মেছে এখানে-সেখানে।

পঞ্চানন্দ একটার পর একটা ঘর পার হতে লাগল।

পশ্চিম দিকে যে হলঘরটা রয়েছে সেটা ততটা ভাঙা নয়। তবে চারদিক থেকে ইঁট বালি এবং আরও সব ধ্বংসস্তূপ পড়ে ঘরটা একেবারে দুর্গম জায়গা হয়ে গেছে।

পঞ্চানন্দ খুঁজে খুঁজে একটা জায়গায় একটা রন্ধ্র বের করে ফেলল। উঁকি দিয়ে দেখল, ঘরটা ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। তবু অনেকক্ষণ চোখ রাখল সে

ভিতরে।

একটা ইঁদুর বা ছুঁচো যেন ডাকল ভিতরে। চিঁ-চিক-চিক।

পঞ্চানন্দ হতাশ হয়ে সরে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ তার একটা খটকা লাগল। ইঁদুর বা ছুঁচোর ডাক সে জীবনে অনেক শুনেছে। এ-ডাকটা অনেকটা সেরকম হলেও হুবহু একরকম নয়। একটু যেন তফাত আছে।

পঞ্চানন্দ ফুটোটায় কান পাতল। এবার আর ছুঁচো বা ইঁদুরের ডাক বলে ভুল হল না। স্পষ্টই একটা যান্ত্রিক আওয়াজ। একটা কোনও সংকেত।

ফুটোর মধ্যে একটা দেশলাইকাঠির আগুন ধরলে ভিতরটা দেখা যেতে পারে মনে করে পঞ্চানন্দ ফুটোতে কান রেখেই দেশলাইয়ের জন্য জামার পকেট হাতড়াতে লাগল।

ঠিক এ-সময়ে খুব মোলায়েম হাতে কে যেন তার কানটা একটু মলে দিয়ে বলে উঠল, "এখানে কী হচ্ছে ?"

আঁতকে উঠে পঞ্চানন্দ এমন একটা লাফ মেরেছিল যে, আর একটু হলেই হাইজাম্পের বিশ্বরেকর্ড ভেঙে ফেলত। লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে পঞ্চানন্দ মিটিমিটি চোখে চেয়ে দেখল, পাঁচ-সাতজন ছেলেছোকরা দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে।

পঞ্চানন্দ বুদ্ধি হারাল না। একগাল হেসে গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এই একটু দেখছিলাম আর কি!"

একটা কেঁদো চেহারার ছোকরা ধমক দিয়ে বলল, "এখানে দেখার আছেটা কী ?"

পঞ্চানন্দ নির্বিকারভাবে বলল, "শুনেছিলাম বাড়িটা বিক্রি হবে। তাই অবস্থাটা একটু নিজের চোখে দেখে গেলাম আর কি। এ-অঞ্চলে একটা বাড়ি কেনার ইচ্ছে অনেক দিনের।"

কেঁদোটা এক পা এগিয়ে এসে গমগমে গলায় বলল, "আর এদিকে গজদার ঘর জিনিসপত্র হাটকে-মাটকে রেখেছে কে ?"

"আজ্ঞে, আমি না। গজ'র সঙ্গে দেখা করতেই আসা। সে আমার সম্পর্কে মাসতুতো ভাই হয়। গজ কোথায় গেছে তা আপনারা বলতে পারেন ?"

ছেলেগুলো একটু মুখ-চাওয়াচায়ি করল। তারপর কেঁদোটা একটু হটে গিয়ে বলল, "আমরা গজদার কাছে কুস্তি শিখি। কিন্তু গজদাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। আমরাও তাকে খুঁজছি।"

পঞ্চানন্দ খুব চিন্তিতভাবে বলল, "তা হলে তো বেশ মুশকিলই হল। গজ'র চিঠি পেয়েই আসা। সে-ই এ বাড়ির খবর দিয়েছিল কিনা।"

একটা ছেলে বলল, "আপনি কি সোজা স্টেশন থেকে আসছেন ? তা হলে আপনার বাক্সটাক্স কোথায় ?"

পঞ্চানন্দ খুব অমায়িক হেসে বলল, "গজ'র কাছে এসে উঠব, এমন আহাম্মক আমি নই। আমি উঠেছি ন্যাড়াদের বাড়িতে। ন্যাড়াকে বোধহয়

আপনারা চেনেনও।"

"ন্যাড়া!" বলে সকলে আবার মুখ-চাওয়াচায়ি করে।

"আজ্ঞে। আমি হলুম গে হরিবাবুর ম্যানেজার। তাঁর বাবার আমল থেকেই যাতায়াত। মাঝখানে কয়েকটা বছর হিমালয়ে তপস্যা করতে যাওয়ায় সম্পর্কটা একটু ঢিলে হয়ে গিয়েছিল।"

সকলে বেশ সম্ভ্রমের চোখে পঞ্চানন্দের দিকে তাকায়।

কেঁদো বলে, "তা দাদার নামটা কী?"

"পঞ্চানন্দ। ওটি সাধনমার্গের নাম। ওতেই ডাকবেন।"

"আমাদের মাপ করে দেবেন। খুব অন্যায় হয়ে গেছে।"

পঞ্চানন্দ উদার গলায় বলল, "করলাম।"

আঠারো

ছেলেগুলো এসে পঞ্চানন্দকে একেবারে ঘিরে ধরল। ভারী লজ্জিত তারা। ষণ্ডামতো একটা ছেলে বলল, "পঞ্চানন্দদা আমরা যে আপনার সঙ্গে বেয়াদপি করে ফেলেছি সে-কথা গজদাকে বলবেন না।"

পঞ্চানন্দ একগাল হেসে বলল, "আরে না। তোমরা সবাই বুঝি গজ'র ছাত্র? বাঃ বাঃ। তা গজ একটু-আধটু কুস্তি শিখেছিল বটে শেরপুরে থাকতে। আমিই শেখাতুম। অবশ্য আসল-আসল প্যাঁচগুলো শেখানোর সময়ই তো পেলাম না। হিমালয় থেকে আমার ডাক এসে গেল কিনা। তবে শুনেছি, গজ বেশ ভালই লড়েটড়ে।"

ছেলেগুলো এ-কথায় মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল। ষণ্ডাটা বলল, "তা হলে আপনিই কেন আমাদের আজ একটু তালিম দেন না!"

পঞ্চানন্দ জিব কেটে বলল, "ও বাবা, গুরুর বারণ। ঠিক বটে, এক সময়ে যারা ধর্মকর্ম করত, তারাই নানারকম শারীরিক প্রক্রিয়া আর কূট প্যাঁচ আবিষ্কার করেছিল। এই যেমন যুযুৎসু, কুংফু, আসন। কিন্তু আমার গুরু আমাকে ও লাইনে একদম যেতে বারণ করেছেন। আসলে হল কী জানো?"

"কী পঞ্চানন্দদা?"

"যার সঙ্গেই লড়তে যাই তারই ঘাড় ভাঙে কি হাত ভাঙে কি ঠ্যাং ভাঙে। যত মোলায়েম করেই ধরি না কেন, একটা কিছু অঘটন ঘটেই যায়। সেবার তো গ্রেট এশিয়ান সার্কাসের হাতিটা খেপে বেরিয়ে পড়ল। বিস্তর লোক জখম হল তার পায়ের তলায় আর শুঁড়ের আছাড়ে। অগত্যা আমি গিয়ে হাতিটাকে সাপটে ধরলুম। ও বাবা, মড়াত করে দুটো পাঁজর ভেঙে হাতিটা নেতিয়ে পড়ল। তারপরই গুরু বারণ করলেন, ওরে তোর শরীরে যে স্বয়ং শক্তি ভর করে আছেন। আর কখনও কুস্তিটুস্তি করতে যাস না।"

ছেলেগুলো মুখ তাকাতাকি করতে লাগল। ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। না করলেও পঞ্চানন্দের ক্ষতি নেই। ছেলেগুলোকে অন্যমনস্ক রাখাটাই

তার উদ্দেশ্য। হলঘরের ভিতর থেকে যে যান্ত্রিক শব্দটা আসছে সেটা ওদের কানে না যাওয়াই ভাল। পঞ্চানন্দকে একাই ব্যাপারটা দেখতে হবে।

ষন্ডাটা বলল, "এক-আধটা প্যাঁচও কি শেখাবেন না দাদা?"

পঞ্চানন্দ গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলল, "উপায় নেই রে ভাই। তবে এই বাড়িটা কিনে যদি সাধনপীঠ বানাতে পারি তখন দেখা যাবে।"

এ-কথায় ছেলেগুলো ফের মুখ-তাকাতাকি করল। কেঁদো চেহারার ছেলেটা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার বলল, "দাদা, একটা কথা বলব? আপনি যদি ডাইরেক্টলি আমাদের না শেখান তা হলেও ক্ষতি নেই। আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে কুস্তি করব, আর আমাদের কোথায় ভুল হচ্ছে তা আপনি দেখে-দেখে বলে দেবেন, তা হলে কেমন হয়?"

সব ছেলেই এ-কথায় সায় দিয়ে উঠল।

পঞ্চানন্দ মাথা চুলকে বলল, "সেট মন্দ হবে না। তা তাই হোক।"

বাড়ির পিছন দিকটায় মাটি কুপিয়ে কুস্তির আখড়া হয়েছে। ছেলেরা সেখানে একটা গাছতলায় পঞ্চানন্দকে বেশ খাতির করে বসিয়ে নিজেরা দঙ্গলে নামল।

পঞ্চানন্দ খুব মাথা নাড়তে লাগল কুস্তি দেখে। এক-এক বার বলে ওঠে, "উহুঁহুঁ, হল না। পা-টা আর একটু কেতরে নিয়ে বল্টান মারতে হয়···আরে আরে, ওরকম পটকান দিতে হলে যে শিরদাঁড়া শক্ত রাখতে হয়···আহা-হা, ওরকম ঠেলাঠেলি করলে চলে? পট করে কাঁধ ছেড়ে কোমরটা ধরে নাও এইবেলা···ওটা কী হল হে? ছ্যা, ছ্যা, গজ্জটা যে একেবারে কিছুই শেখায়নি তোমাদের!"

ঘণ্টা দেড়েক এরকম চালিয়ে পঞ্চানন্দ ছুটি পেল।

ঝিমঝিম করছে দুপুর। পঞ্চানন্দ পা টিপে-টিপে বাড়িতে ঢুকে আবার সেই হলঘরটার দিকে এগোল।

হঠাৎই সাক্ষাৎ এক ডাইনিবুড়ি কোত্থেকে যে বকবক করতে-করতে এসে উদয় হল, তা বলা শক্ত। তবে পঞ্চানন্দ একটা থামের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে পরিষ্কার শুনতে পেল বুড়িটা আপনমনে গজগজ করছে, "রোজ আমি হিরুকে এইখানে ঘাস খেতে বেধে রেখে যাই, লক্ষ্মী ছাগল আমার কোনওদিন পালায় না। আজ কোন অলপ্পেয়ে যে বাছাকে আমার গেরাস করতে এল গো!"

বলতে-বলতে বুড়ি হাঁটপাট করে চারদিকে ঘুরছিল। শনের মতো সাদা চুল, শরীরের চামড়ায় শতেক আঁকিবুকি, মুখখানা শুকনো, চোখ গর্তে, হাতে একখানা গাঁটওলা লাঠি।

পঞ্চানন্দ একটু গলাখাঁকারি দিল।

"কে রে? কোন মুখপোড়া? হিরিকে কি তুই গেরাস করেছিস রে ড্যাকরা? আয়, সামনে আয় তো!"

পঞ্চানন্দ একবার বলবার চেষ্টা করল, "আমি নয় গো, আমি নয়!"

কিন্তু কে শোনে কার কথা। বুড়ি একেবারে লাঠি উঁচিয়ে ধেয়ে আসতে-আসতে বলল, "তুই না তো কে রে মুখপোড়া? তোর মুখ দেখলেই তো বোঝা যায় গোরু-ছাগল চুরি করে-করে হাত পাকিয়ে ফেলেছিস। চোখ দেখলেই তো বোঝা যায় তুই এক নম্বরের পাজি। তোকে আজ ঝেঁটিয়ে বিষ নামাব..."

পঞ্চানন্দ পিছু ফিরে চোঁ-চোঁ দৌড় দিল। এ-কাজটা সে খুব ভাল পারে।

দৌড়ে একেবারে হরিবাবুদের বাড়ির কাঁঠালতলায় এসে পঞ্চানন্দ হাঁফ ছাড়ল, "খুব বাঁচা গেছে বাপ্। ওঃ, বুড়িটা কী তাড়াই না করেছিল!"

জামা দিয়ে মুখের ঘাম মুছে পঞ্চানন্দ ধীরেসুস্থে বাড়িতে ঢুকতে যাবে, এমন সময় হঠাৎ ক্যাঁক করে কে যেন তার গর্দানটা বাগিয়ে ধরল খিড়কির দরজার কপাটের আড়াল থেকে।

"দাদা, এই লোকটাই।"

পঞ্চানন্দ সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, "আমি না। কালীর দিব্যি, আমি কিছু করিনি।"

আংটি বলল, "তুমি নয় তো কে চাঁদু? কাল মাঝরাতে দাদুর ল্যাবরেটরির কাছে ঘুরঘুর করছিলে, দেখিনি বুঝি?"

কপাটের আড়াল থেকে আর-একজনও বেরিয়ে এল, ঘড়ি। খুব ঠান্ডা চোখে পঞ্চানন্দকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, "খুব গুলগপ্পো ঝেড়ে আমার বাবাকে বশ করে ফেলেছ কেমন?"

পঞ্চানন্দ অমায়িক হেসে বলল, "আজ্ঞে, অনেক কথার মধ্যে এক-আধটা বেফাঁস মিথ্যে কথা বেরিয়ে যেতে পারে বটে, কিন্তু সে তেমন না ধরলেও চলে। হরিবাবুকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, আমি তাঁকে আগেভাগেই সাবধান করে দিয়েছিলুম কি না যে, লোক আমি তেমন সুবিধের নই।"

"বটে! তা হলে তো ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। বাবাকে একটা চাবি দিয়েছ শুনলাম, আর নাকি গুপ্তধনের সংকেত!"

জিব কেটে পঞ্চানন্দ মাথা নাড়ল, "আজ্ঞে ওসব বুজরুকি কারবার আমার কাছে পাবেন না। গুপ্তধনের কথা শিবুবাবু আমাকে বলতে বলেননি, আমিও বলিনি।"

"তাহলে কথাটার মানে কী?"

পঞ্চানন্দ কাঁচুমাচু হয়ে বলে, "সে কি আমিই জানি? যেমন শুনেছি তেমনি বলেছি। তা ঘাড়খানা এবার ছেড়ে দিলে হয় না? বড্ড টনটন করছে। আমার আবার একখানা বই দুখানা ঘাড় নেই।"

আংটি একটু হেসে একখানা ঝাঁকুনি দিয়ে ঘাড়টা ছেড়ে বলল, "একটা কথা শুনে রাখো। আমার বাবা বেজায় ভাল মানুষ। তাঁকে যদি বোকা বানানোর চেষ্টা করো, তা হলে মাটিতে পুঁতে ফেলব ওই কেয়াঝোপের তলায়।"

পঞ্চানন্দ উদাস মুখে বলল, "তিনটে লাশ ছিল, চারটে হবে।"

"তার মানে ?"

"আজ্ঞে সে এক বৃত্তান্ত। কিন্তু আপনাদের যা ভাবগতিক দেখছি, বেশি বলতে ভরসা হয় না। হয়তো দিলেন কষিয়ে একখানা ঘুসো।

ঘড়ি গম্ভীরভাবে বলল, "গুলগপ্পো যারা মারে তাদের মাঝে-মাঝে ঘুসো খেতেই হয়। এবার বলো তো চাঁদু, মাঝরাত্তিরে দাদুর ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ঢুকেছিলে কেন ?"

"আজ্ঞে ওই গজটার জন্য। কতবার পই-পই করে বলেছি, ওরে গজ, মানুষ হ। পরের বাড়িতে ঢুকে ওসব করা কি ঠিক ? তা ভাল কথায় কবেই বা কান দিয়েছে ?"

"গজ মানে কি গজ-পালোয়ান ? সে কেন আমাদের বাড়িতে ঢুকবে ?"

"সেইটেই তো কথা। পেত্যয় না হয় ন্যাড়াবাবুর কাছ থেকেই শুনে নেবেন'খন।"

ঘড়ি ঠাণ্ডা চোখে আবার একবার তাকে জরিপ করে নিয়ে বলল, "তোমার স্যাঙাতরা কারা ছিল ?"

"স্যাঙাত! আজ্ঞে কোনওকালেই আমার স্যাঙাত-ট্যাঙাত নেই। বরাবর একাবোকা ঘুরে বেড়াই।"

"তবে কেয়াঝোপের আড়াল থেকে তিনটে লোক যে বেরিয়ে এল, তারা কি ভূত ?"

পঞ্চানন্দ তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, "ও কথা বলবেন না। এখনও বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করে। একেবারে জলজ্যান্ত তেনারা। আমার হাত দুয়েকের ভিতর দিয়েই হেঁটে গেলেন। গায়ে সেই বোঁটকা গন্ধ, উলটো দিকে পা, হাওয়ায় ভর দেওয়া শরীর···ওরে বাবা! ভাবতেও ভয় করে।"

ঘড়ি ভ্রূ কুঁচকে চিন্তিতভাবে পঞ্চানন্দের দিকে চেয়ে বলল, "আমরা ভূতটুত মানি না। ওসব বুজরুকি আমাদের দেখিও না। দাদুর ল্যাবরেটরির দিকে অনেকের নজর আছে, আমরা জানি। কিন্তু আমরাও বোকা নই, বুঝলে ? ওই তিনটে লোক তোমারই দলের।"

পঞ্চানন্দ খুব গম্ভীর হয়ে বলল, "আজ্ঞে ভূত যদি নাও হয়, তা হলেও আমার সঙ্গে তাদের কোনও সাঁট নেই। তবে ওইখানে তিনটে লাশ বহুকাল আগে আমি আর শিবুবাবু মিলে পুঁতেছিলুম। তিনটেই সাহেব। গায়ে-গতরে পেল্লায়। বিশ্বাস না হলে জরিবাবু বা হরিবাবুকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।"

ঘড়ি বলল, "লাশ এল কোথা থেকে ?"

পঞ্চানন্দ দু'পা পিছু হটে বলল, "আজ্ঞে রন্দা-ফন্দা চালিয়ে বসবেন না যেন। এই সময়টায় আমার বড় খিদে পায়। আর খিদের মুখে মারধোর আমার সয় না।"

"ঠিক আছে, মারব না। বলো।"

"আজ্ঞে শিবুবাবু নিজের জান বাঁচাতে ওই তিন সাহেবকে খুন করেন। তারপর আমরা ধরাধরি করে…"

"মিথ্যে কথা!"

"আজ্ঞে খুনটা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তবে কিনা নিজের জান বাঁচাতে খুন করলে সেটা খুনের মধ্যে ধরা যায় না।"

"জান বাঁচাতে কেন? ওরা কি দাদুকে মারতে চেয়েছিল?"

পঞ্চানন্দ বলল, "সে কে আর না চাইত বলুন। শিবুবাবু মরলে অনেকেরই সুবিধে ছিল।"

"খোলসা করে বলো।"

পঞ্চানন্দ বলল, "বলব'খন। আগে চানটান করে দুটো মুখে দিয়ে নিই, পিত্তি পড়লে আবার অনর্থ হবে'খন।"

কী ভেবে যেন ঘড়ি আর আংটি এ-প্রস্তাবে আপত্তি করল না। বলল, "ঠিক আছে।"

উনিশ

হরিবাবুর খোকা দুটি যে বিশেষ সুবিধের নয়, তা পঞ্চানন্দ লহমায় বুঝে গেল। ওদের একজন হল গোমড়ামুখো গুণ্ডা, অন্যটা ছ্যাবলা গুণ্ডা। ছ্যাবলাদের তেমন আমল না দিলেও চলে, কিন্তু গোমড়াগুলোই ভয়জনক। কখন কী ভাবছে তা মুখ দেখে টের পাওয়া যায় না। তবে যতই গুণ্ডা হোক, পঞ্চানন্দ লক্ষ করেছে যে, ওরা ওদের বাপকে সাংঘাতিক ভয় পায়।

চানটান করে পঞ্চানন্দ যখন গিয়ে খেতে বসল, তখন দুপুর বেশ গড়িয়ে গেছে। এ-সময়ে গরম ভাতের আশা বৃথা। পঞ্চানন্দ ধরে নিয়েছিল, ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত আর তলানি কিছু ডাল তরকারি জুটতে পারে।

কিন্তু খেতে বসার পর বামুনঠাকুর যখন ধোঁয়া-ওঠা ভাত আর গরম-গরম ডাল-তরকারি আর মাছের ঝোলের বাটি সাজিয়ে দিল, তখন রীতিমত অবাক। ভাত ভাঙতে-ভাঙতে বলল, "জরুরি একটা কাজে গিয়েছিলুম কিনা, তাই একটু দেরি হয়ে গেল।"

রাঁধুনি বিনয়ের সঙ্গে বলল, "তাতে কী বাবু? ওরকম হয়েই থাকে।"

পঞ্চানন্দ খেতে-খেতে বলল, "শেষপাতে একটু দই না হলে আবার আমার তেমন জুত হয় না।"

"আজ্ঞে, আছে। দই, কলা, চিনি সব সাজিয়ে রেখেছি।"

"বাঃ বাঃ, তুমি তো কাজের লোক হে। নাঃ, বাবুকে বলে তোমার মাইনেটা দু'পাঁচ টাকা বাড়িয়ে না দিলেই নয়।"

রাঁধুনি লাজুক মুখ করে একটু হাসল। তারপর গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "আপনি যে কী একটা পুঁটুলি আমার কাছে রাখবেন বলেছিলেন?"

পঞ্চানন্দ চট করে একটু ভেবে নিল। কখন কাকে কী বলে, তা তার হিসেবে থাকে না। হঠাৎ তার মনে পড়ল, রাত্রে এরকম একটা কথা বলেছিল বটে রাঁধুনিকে। মনে পড়তেই একটু হেসে বলল, "কথাটা বলে ভালই করেছ। পুঁটুলিটা নিয়ে দুশ্চিন্তা। সোনাদানা কিছু তার মধ্যে আছে বটে, তবে বেশি নয়। বারো-চোদ্দ ভরি হবে মেরেকেটে। শেরপুরের রাজা একখানা মুর্গির ডিমের সাইজের হিরে দিয়েছিল একবার আমার গান শুনে। সেটাও বোধহয় আছে। কিন্তু ওগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই রে ভাই। সন্ন্যাসী-বৈরাগী মানুষ আমি, ওসব দিয়ে কী-ই বা হবে। তবে হিমালয়ে থাকতে একবার খাড়াবাবার ডাক এল মানস-সরোবর থেকে। গিয়ে পড়তেই খাড়াবাবা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন, 'ওরে পঞ্চা, আমি হলাম গিয়ে খাড়া-সন্ন্যাসী, বসা বা শোওয়ার জো নেই, দিনরাত একঠ্যাং বা দুঠ্যাঙে ভর করে খাড়া হয়ে সাধন-ভজন করতে হয়। কিন্তু একটা বেকুফ ভূত এসে সারাক্ষণ আমার ঠ্যাং ধরে টানাটানি করে, পায়ে সুড়সুড়ি দেয়, হাঁটুতে গুঁতোয়। একঠা ব্যবস্থা কর বাবা।' তা তখন মন্ত্র পড়ে চারদিকে বন্ধন দিয়ে নিয়ে ঘণ্টা-খানেকের চেষ্টায় একটা পলো দিয়ে তো ভূতটাকে পাকড়াও করলাম। ভারী নচ্ছার ভূত, ছাড়া পেলেই চারদিক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করে বেড়াবে। তাই একটা কৌটোয় ভরে পুঁটুলিতে রেখে দিয়েছি।"

রাঁধুনি আঁতকে উঠে বলল, "ও বাবা!"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলল, "ভয়ের কিছু নেই, আমি তো আছিই। তবে পুঁটুলিটা হুট করে খুলেটুলে ফেলো না। নাড়াচাড়ায় কৌটোর ভূত যদি জেগে যায়, আর বোঝে যে আনাড়ির হাতে পড়েছে, তা হলেই কিন্তু কুরুক্ষেত্র করে ছাড়বে।

রাঁধুনি মাথা চুলকে বলল, "পুঁটুলিটা বরং আপনার কাছেই থাক। আমি বরং দইটা নিয়ে আসছি।"

বলে রাঁধুনি পালাল।

খাওয়াটা মন্দ হল না পঞ্চানন্দর। ঢেকুর তুলে তৃপ্ত মুখে উঠে সে আঁচিয়ে নিল। তারপর গিয়ে জরিবাবুর ঘরে ঢুকল।

জরিবাবু কলেজে পড়ান। এ-সময়টায় ঘরে থাকেন না। পঞ্চানন্দ নিজেই একখানা পান সেজে মুখে দিল। তারপর শুয়ে একটু গড়াল।

যখন তার ঘুম ভাঙল, তখন জরিবাবু ফিরেছেন এবং সন্তর্পণে জামাকাপড় পাল্টাচ্ছেন। তাকে দেখে একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, "ইস্, আপনার ঘুমটা বোধহয় ভেঙে দিলাম।"

পঞ্চানন্দ অবাক হয়ে বলল, "ঘুম! ঘুমটা কোথায় দেখলেন? গত তেইশ বছর আমার ঘুম কেউ দ্যাখেনি। ঘুমের মতো যা দ্যাখেন, তা হল যোগনিদ্রা। মনটাকে কূটস্থে ফেলে ধ্যান করতে করতে সূক্ষ্মদেহে বেরিয়ে পড়ি আর কি! কখনও বিলেত ঘুরে আসি, কখনও উত্তর-মেরু চলে যাই, যখন যেখানে প্রয়োজন

মনে হয়। চাঁদে তো হামেশাই যেতে হয়। মঙ্গলগ্রহে, শুক্রে, বৃহস্পতিতে, কোথায় ডাক না পড়ে বলুন।"

জরিবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, "কিন্তু আপনার যে নাক ডাকছিল।"

পঞ্চানন্দ খুব উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলল, "মুশকিল কী জানেন? দেহ ছেড়ে আমি যখন বেরিয়ে পড়ি, তখন দেহটা একেবারে মড়ার মতো হয়ে যায়। শ্বাস চলে না নাড়ি থেমে যায়। লোকে ভাবে, সত্যিই বুঝি পঞ্চানন্দ পটল তুলেছে। একবার তো কাশীতে ওই অবস্থায় আমাকে মড়া ভেবে দাহ করতে মণিকর্ণিকায় নিয়েও গিয়েছিল। ভাগ্যিস সময়মতো নেবুলাটা চক্কর মেরে ফিরে এসেছিলাম। নইলে হয়ে যেত। শরীর গেলে ভারী অসুবিধে। সেই থেকে করি কী, সূক্ষ্মদেহে বেরিয়ে পড়ার আগে নাকটাকে চালু রেখে যাই। ওটা ডাকলে আর কেউ মরা মানুষ বলে ভাববে না।"

জরিবাবুর খুবই কষ্ট হচ্ছিল বিশ্বাস করতে। কয়েকবার ঢোঁক গিললেন, ঠোঁট কামড়ালেন, গলাখাঁকারি দিলেন। তারপর বললেন, "তা ভাল, বেশ ভাল।"

পঞ্চানন্দ একটা হাই তুলে বলল, "তা আজও একটা চক্কর মেরে এলুম।"

জরিবাবু এত অবাক হয়েছেন যে, গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। খানিক বাদে ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কোথা থেকে?"

পঞ্চানন্দ আড়মোড়া ভেঙে বলল, "বেশি দূরে যেতে হল না। ভেবেছিলুম, একবারে ব্রহ্মলোকের সাত নম্বর সিঁড়িতে গিয়ে শিবুবাবুকে ধরব।"

"সাত নম্বর সিঁড়ি?"

পঞ্চানন্দ খুবই উচ্চাঙ্গের একখানা হাসি হেসে বলল, "শিবুবাবু একেবারে ব্রহ্মলোকের দোরগোড়াতেই পৌঁছে গেছেন বলা যায়। আর সাত ধাপ উঠলেই সাক্ষাৎ-ব্রহ্মলোক। তবে কিনা যত কাছাকাছি হবেন ততই ওঠা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। শুনতে সাত ধাপ বটে, কিন্তু ওই সাত ধাপ পেরোতেই হয়তো লাখ লাখ বছরের তপস্যা লেগে যাবে। তবে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে উঠেছেন অনেকটা। তা ভাবলাম সেখানেই চলে যাই। জায়গাটা বেশ সাফসুতরো, নির্জন, সিঁড়ির ধাপে বসে দুটো সুখদুঃখের কথাও কয়ে আসি আর বাড়ির সব খবর-টবরও দিয়ে আসি। শুনে শিবুবাবু খুশি হবেন। তা অতদূর আর যেতে হল না। কৈলাসটা পেরোতে দেখি, শিবুবাবু নিজেই হন্তদন্ত হয়ে নেমে আসছেন। আমাকে দেখেই বললেন, ওরে পঞ্চা, আমার বাড়িতে গিয়েছিস সে খবর পেয়েছি। বলি ওরা তোকে খাতিরযত্ন ঠিকমতো করছে তো! খাওয়া-শোওয়ার কোনও অসুবিধে নেই তো! এই শীতে গায়েই বা দিচ্ছিস কী?"

জরিবাবু চোখ গোল করে তাকিয়ে রইলেন।

পঞ্চানন্দ আড়চোখে ভাবখানা লক্ষ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, "আমি আর কী বলি! বললুম, ভালই আছি। কিছু-কিছু অসুবিধে সে তো হতেই পারে। তখন শিবুবাবু ভারী দুঃখ করে বললেন, ওরে পঞ্চা, আমার বড় ছেলেটাকে খরচের খাতায় লিখে রেখেছি, মেজোটাও বোধহয় মানুষ

হল না, সেজোটা পুলিশে ঢুকে গোল্লায় গেছে, ছোটটা তো গবেট। তা তুই যখন গিয়ে পড়েছিস সেখানে, আমার ছেলেগুলোকে একটু দেখিস বাবা।"

জরিবাবু কী একটা বলবেন বলে হাঁ করেছিলেন, কিন্তু স্বর ফুটল না।

পঞ্চানন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "পরের বেগার খেটে-খেটে পঞ্চানন্দর আর নিজের জন্য কিছু করা হয়ে উঠল না। দুনিয়াটার নিয়মই এই। তা চায়ের ব্যবস্থাটা এ-বাড়িতে কীরকম বলুন তো জরিবাবু? পাঁচটা বাজতে চলল যে! এরপব চা খাওয়ার যে শাস্ত্রে বারণ।"

জরিবাবু শশব্যস্তে বললেন, "দাঁড়ান দেখছি।"

পঞ্চানন্দ মোলায়েম স্বরে বলল, "খালি পেটে চা খাওয়াটা কিন্তু মোটেই কাজের কথা নয়। গোটাকতক ডিমভাজা আর মাখন-টোস্টেরও ব্যবস্থা করে আসবেন।"

জরিবাবুর ব্যবস্থায় চা এল, টোস্ট আর ডিমভাজাও এল। পঞ্চানন্দ খেয়ে-দেয়ে উঠে ঢেকুর তুলে বলল, "এবার একখানা পান লাগান।"

পান চিবোতে-চিবোতে পঞ্চানন্দ যখন জরিবাবুকে ছেড়ে হরিবাবুর সন্ধানে দোতলায় এল, তখন হরিবাবুর বাহ্যজ্ঞান নেই। টেবিলে স্তূপাকৃতি খাম, পোস্টকার্ড আর ইনল্যান্ড। তিনি পোস্টকার্ডের পর পোস্টকার্ডে কবিতা লিখে চলেছেন।

পঞ্চানন্দ একটা গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "আজ্ঞে কাজ তো বেশ এগোচ্ছে দেখছি।"

হরিবাবু মুখ তুলে খুব পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, "অফিসের পথেই ডাকঘর। নিজেই পঞ্চাশ টাকার কিনে আনলাম। আইডিয়াটা বেশ ভালই হে।"

পঞ্চানন্দ একটু চাপা গলায় বলল, "এসব কাজ করার সময় দরজাটা এঁটে নেবেন ভালমতন। গিন্নি-মা যদি দেখে ফেলেন তবে কিন্তু কুরুক্ষেত্তর হবে।"

"তা বটে, ওটা আমার খেয়াল হয়নি। আচ্ছা পঞ্চানন্দ, এই ধরো রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী আর মুখ্যমন্ত্রীকে যদি চিঠিতে কবিতা পাঠাই, তবে কেমন হয়?"

"সে তো খুবই ভাল প্রস্তাব। তাঁদের হাতেই তো সব কলকাঠি। কবিতা পড়ে যদি কাত হয়ে পড়েন তো আপনার কপাল খুলে গেল। সভাকবি-টবিও করে ফেলতে পারেন।"

"দূর! সভাকবি আজকাল আর কেউ হয় না।"

"নিদেন দরবারে তো ডাক পড়তে পারে। চাই কি নোবেল প্রাইজের খাতায় আপনার নাম তুলবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে যাবেন তিনজনে।"

হরিবাবু একটু ব্যথিত হয়ে বললেন, "নোবেল প্রাইজের কথা থাক। এ-দেশের সম্পাদকরাই আমার কবিতা ছাপল না, তো নোবেল প্রাইজ। তবে আমি ঠিক করেছি নিজের খরচে একখানা কবিতার বই ছেপে বের করব।"

"সে তো হেসে-খেলে হবে। টাকাটা ফেলে নিশ্চিন্তে কবিতা লিখে যান, ছাপাখানা থেকে দফতরির বাড়ি দৌড়োদৌড়ি যা করার আমিই কবব। তা আজ এক-আধখানা কবিতা নামিয়েছেন তো। একখানা ছাড়ুন শুনি।"

"শুনবে।" বলে একটু লজ্জার হাসি হাসলেন হরিবাবু। তারপর গলাখাঁকারি দিয়ে শুরু করলেন :

কবিতা কখনও ক্ষমা করে না কবিরে।
ক্ষমা পায় হত্যাকারী, ক্ষমা লভে চোর,
ডাকাত, মস্তান আর যত ঘুষখোর—
সিক্ত হয় ক্ষমারূপ বৃষ্টিবারিধারে।
কবির বাগানে নাচে প্রেত, ডাকে তারে
মরীচিকা। তা-ই কাব্য, যমের দোসর।
কবিরে শোষণ করে, দিয়ে দেয় গোর।
কবিতা কখনও ক্ষমা করে না কবিরে।

কুড়ি

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে-নেড়ে শুনছিল। বলল, "আবার একবার পড়ুন তো।"

পুলকিত হরিবাবু আবার পড়লেন।

পঞ্চানন্দ কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে বলল, "চোখের জল রাখা যায় না। আহা, কী জিনিসই লিখেছেন। বুকটা যেন খাঁ-খাঁ করে ওঠে, জিব শুকিয়ে যায়, আর তেষ্টায় যেন ছাতি ফাটতে থাকে।"

হরিবাবু বিনয়ে মাথা চুলকোলেন।

পঞ্চানন্দ কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থেকে বলল, "নাঃ, তেষ্টাটা বড্ড চেপে বসেছে বুকে। তা হরিবাবু, বলে আসব নাকি চায়ের কথাটা? সঙ্গে একটু ঝাল চানাচুর।"

হরিবাবু প্রশংসায় এমনই বিগলিত হয়ে পড়েছিলেন যে, ফশ করে বলে বসলেন, "আহা, শুধু ঝাল চানাচুর কেন, বেশ গরম গরম কড়াইশুটির কচুরি ভাজছে ভজুয়ার দোকানে। রেমোটাকে পাঠাও, এনে দেবে।"

এ-কথায় পঞ্চানন্দ আর একবার চোখ মুছে উঠে গেল। কচুরি আর চায়ের ব্যবস্থা করে ফিরে এসে বেশ গম্ভীর মুখে সে বলল, "এ দেশটার কিছু হল না কেন জানেন? ভাল জিনিসের সমঝদার নেই বলে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বা আকবরের আমল হলে আপনি নির্ঘাত সভাকবি হয়ে বসতেন।"

হরিবাবু খুব লাজুক মুখে হাসতে লাগলেন।

পঞ্চানন্দ নিমীলিত নয়নে খাটের তলায় একখানা তালা-দেওয়া তোরঙ্গকে লক্ষ করতে করতে বলল, "অবশ্য পঞ্চানন্দ তা বলে হাল ছাড়বে না। কাল সকালে শ-দুয়েক টাকা একটু গোপনে আমার হাতে দিয়ে দেবেন তো। কিছু

খাম-পোস্টকার্ড কিনে ফেলব'খন, আর পোস্টারের ব্যবস্থা করতে হবে। খরচটা নিয়ে বেশি ভাববেন না। পেটের পুজো তো অনেকেই করে, কাব্যলক্ষ্মীর পুজো অনেক উঁচু দরের ব্যাপার। খরচটা গায়ে মাখলে তো চলবে না।"

হরিবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "বটেই তো। তা টাকাটা তুমি এখনই নিয়ে রাখতে পারো।"

জিব কেটে পঞ্চানন্দ বলল, "না, না, আমাকে অত বিশ্বেস করে বসবেন না। লোকটা আমি তেমন সুবিধের নই। টাকা হাতে এলেই লোভ চাগাড় দেয়। আর লোভ থেকে কত কী হয়। ও কাল সকালেই দেবেন'খন।"

হরিবাবু খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে খুব সংকুচিত গলায় বললেন, "তা ইয়ে, বলছিলাম কী, আরও গোটাকয় পড়ব নাকি?"

পঞ্চানন্দ একটু আঁতকে উঠে বলল, "আজ্ঞে, ভাল জিনিসের বেশি কিন্তু ভাল নয়। ধরুন পোলাও মাংস খাচ্ছেন, গুচ্ছের খেয়ে ফেললে কিন্তু পেট ভারী আইঢাই হতে থাকে। আর তাতে সোয়াদটাও তত পাওয়া যায় না। এই যে একখানা শোনালেন, এইটে মাথায় অনেকক্ষণ ধরে রেখে, গোরুর মতো মাঝে-মাঝে উগরে এনে জাবর কেটে যতটা আনন্দ হবে, এক গুচ্ছের শুনলে ততটা হওয়ার নয়।"

হরিবাবু ম্লানমুখে বললেন, "তা বটে। তা হলে আজ থাক।"

রেমো কচুরি আর চা দিয়ে গেল। পঞ্চানন্দ নিমীলিত চোখে কাঠের আলমারির মাথায় রাখা একখানা চামড়ার সুটকেসকে লক্ষ করতে করতে কচুরি আর চা শেষ করে উঠে পড়ল। বলল, "যাই আজ্ঞে, কবিতাটা নিয়ে শুয়ে শুয়ে একটু ভাবি গে।"

পঞ্চানন্দ বেরিয়ে পড়ল। সাবধানী লোক। সে আগেই দেখে নিল বাড়ির কে কোথায় রয়েছে এবং কী করছে। হরিবাবুর গিন্নি এই সময়ে পুজোর ঘরে থাকেন। কাজেই ওদিকটায় নিশ্চিন্ত। জরিবাবু তানপুরা চেপে ধরে রেওয়াজ করছেন, আরও ঘণ্টা-দুই চলবে। ন্যাড়া ঘরে নেই, আড্ডা মারতে বেরিয়েছে। ঘড়ি আর আংটি সন্ধেবেলা এক মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি পড়তে যায়। চারদিকটা দেখে নিয়ে পঞ্চানন্দ জরিবাবুর ঘরে ঢুকে বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর টর্চবাতিটা তুলে নিল। জরিবাবু চোখ বুজে রেওয়াজ করছেন, লক্ষ করলেন না। পঞ্চানন্দ বেরিয়ে এসে সাবধানে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। তারপর সদর খুলে দ্রুতপায়ে হাঁটা দিল।

চকসাহেবের বাড়ির কাছাকাছি যখন পৌঁছল পঞ্চানন্দ, তখন চারদিকটা অন্ধকার আর কুয়াশায় একেবারে লেপেপুঁছে গেছে। চার হাত দূরের বস্তু ঠাহর হয় না। পঞ্চানন্দও এরকম পরিস্থিতিই পছন্দ করে।

সামনের দিক দিয়ে কোনও বাড়িতে ঢোকা বিশেষ পছন্দ করে না পঞ্চানন্দ। ঘুরপথে, হাঁটুভর কাঁটা-জঙ্গল ভেদ করে একবারও টর্চ না জ্বেলে সে দিব্যি পিছনের বাগানে পৌঁছল। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একটু হিসেব-নিকেশ করে

নিল সে। তারপর আন্দাজের ওপর ভরসায় ধীরে-ধীরে ভাঙা বাড়িটায় ঢুকে পড়ল।

একটু-আধটু হোঁচট, দু'একটা দেয়ালের গুঁতো আর দু-একবার শেয়ালের ডাক কি ছুঁচোর চ্যাঁচানিতে চমকে ওঠা ছাড়া তেমন বিশেষ কোনও বাধা পেল না সে। হলঘরটার কাছ-বরাবর পৌঁছে কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে অপেক্ষা করল সে।

এদিকটায় একেই জনবসতি নেই, তার ওপর শীতের রাত বলে ভারী নিঝুম। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে একটানা যান্ত্রিক শব্দটা বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

পঞ্চানন্দের চোখে অন্ধকার সয়ে এসেছে। ধীরে-ধীরে সে এগিয়ে গেল। তারপর সাবধানে দেওয়ালের সেই ফোকরে চোখ রাখল।

প্রথমটায় কিছুই দেখতে পেল না পঞ্চানন্দ। ঘরটা বেজায় বড়, ফোকরটা নিতান্তই ছোট। তবে অনেকক্ষণ চোখ পেতে রাখার পর ঘরের বাঁ ধারে একটা নীলচে আলোর আভা দেখতে পেল সে। আর কিছু নয়।

পঞ্চানন্দ বুঝল, এই ফোকরটা দিয়ে এর বেশি আর কিছু দেখা যাবে না। সুতরাং খুব সাবধানে সে ফোকরটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ইঁটগুলো নেড়েচেড়ে দেখল যদি কোনওটা খুলে আসে। খানিকক্ষণ চেষ্টার পর বাস্তবিকই একটা ইঁট একটু নড়ল। পঞ্চানন্দের হাত মাখনের মতো কাজ করে। ইঁটটা সামান্য চেষ্টাতেই সে নিঃশব্দে খুলে ফেলতে পারল। ফোকরটা এবার আর একটু বড় হয়েছে। পঞ্চানন্দ চারপাশটা সতর্ক চোখে একবার দেখে নিয়ে ফোকরের মধ্যে উঁকি মারল।

হলঘরটা বাস্তবিকই বিশাল। বাঁ দিকের শেষ প্রান্তে নীলচে আলোটা জ্বলছে। ভারী নরম আর মোলায়েম আলো। এত মৃদু যে ভাল করে ঠাহর না করলে মালুমই হয় না।

পঞ্চানন্দ হাত দিয়ে ফোকরের আর একটু অংশ সাবধানে ভেঙে গর্তটা অল্প একটু বাড়াতে পারল।

এবার নজরে পড়ল, ঘরের বাঁ দিকের শেষ প্রান্তে একটা বড় টেবিল। তার ওপর ফুটবলের চেয়ে একটু বড় সাইজের একটা গ্লোবের মতো বস্তু। সেই গ্লোবের মতো গোলকটা থেকেই নীল আলো ছড়িয়ে পড়ছে। টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে একজন লোক গা ছেড়ে বসে আছে। বেশ মজবুত তার চেহারা। কাঁধখানা বিশাল। একেবারে পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে গোলকটার দিকে চেয়ে আছে।

গোলকটা খুবই বিস্ময়কর। পঞ্চানন্দের অভিজ্ঞ চোখেও এরকম জিনিস এর আগে আর কখনও পড়েনি। কালচে নীল সেই গোলকটার মধ্যে বিন্দু বিন্দু সব আলো মিটমিট করে জ্বলছে। কোনওটা লাল, কোনওটা হলুদ, কোনটা বা সাদা। ছোট বড় মাঝারি নানা রকম আলোর বিন্দু। কিছুই না বুঝে পঞ্চানন্দ একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তবে সে আহাম্মক নয়। মাঝে-

মাঝে সে চোখ ফিরিয়ে সে নিজের চারদিকটা সতর্ক চোখে দেখে নিচ্ছিল।

ঘরের ভিতর অনেকক্ষণ কিছুই ঘটল না। গোলকের সামনে লোকটা চুপ করে বসে আছে। প্রায় আধঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ ঘরের ডান দিকের অন্ধকার থেকে চিঁ-ই-চিক চিঁ-ই-চিক শব্দটা পালটে গিয়ে একটা রাগী বেড়ালের ঘ্যাঁও-ঘ্যাঁও শব্দ হতে লাগল। পঞ্চানন্দ একটু চমকে গেলেও চট করে সামলে নিল নিজেকে। অবিকল রাগী বেড়ালের শব্দ হলেও পঞ্চানন্দের অভিজ্ঞ কান টের পেল, এটাও একটা যন্ত্রেরই শব্দ। বাইরে থেকে লোকে আলটপকা শুনলে বুঝতে পারবে না।

পঞ্চানন্দ নিবিষ্ট মনে ভিতরের আবছায়া ঘরখানার মধ্যে চোখ পেতে রইল। আচমকাই সে দেখতে পেল, ডান ধারের অন্ধকার থেকে লম্বা সিড়িঙ্গে চেহারার একজন লোক এগিয়ে এল। বাঁ ধারে যেখানে পাথরের মতো লোকটা বসে গোলকের দিকে চেয়ে আছে, সেদিকে এগিয়ে গেল লোকটা। হাতে একটা টেপরেকর্ডারের ক্যাসেট। লোকটা নিঃশব্দে টেবিলের ওপর ক্যাসেটটা রেখে বশংবদ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল।

মজবুত চেহারার লোকটা ক্যাসেটটা তুলে নিয়ে টেবিলের তলায় কোনও একটা যন্ত্রে ফিট করল। তারপর খুট্ করে একটা শব্দ হল। পঞ্চানন্দ দেখল, টেবিলের ওপর নীলচে গোলকটার রং পালটে সাদা হয়ে যাচ্ছে। ফুটকিগুলোর বদলে কতগুলো কিম্ভূত রেখা ফুটে উঠছে তাতে। লম্বা এবং আড়াআড়ি রেখাগুলো দ্রুত ফুটে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার অন্য রকম সব রেখা আসছে। লাল, বেগুনি, হলুদ।

কিছুক্ষণ এরকম চলার পর জোয়ান লোকটা মুখ তুলে ঢ্যাঙা লোকটাকে অস্ফুট স্বরে কিছু বলল। ভাষাটা বাংলা কি না তা ধরতে পারল না পঞ্চানন্দ। তবে কান খাড়া করে রইল।

ঢ্যাঙা লোকটা গলা-খাঁকারি দিয়ে বলল, "আজ রাতেই।"

জোয়ান লোকটা আবার একটা সুইচ টিপল টেবিলের তলায়। গোলকটা আগের মতো নীল হয়ে গেল।

নিরিখ-পরখ ক'রে পঞ্চানন্দের মনে হল, গোলকটা খুব সাধারণ জিনিস নয়। খুবই আজব একটা কল। কল না বলে আয়না বলাই বোধহয় ঠিক হবে। কারণ গোলকটার মধ্যে যা ফুটে উঠছে তা আকাশের ছবি। ফুটকি-গুলো হচ্ছে তারা। ছোট একটা গোলকের মধ্যে গোটা আকাশটাকে যেন ভরে রাখা হয়েছে।

জোয়ান লোকটাকেও খুব খর চোখে লক্ষ করল পঞ্চানন্দ। বেশ লম্বা-চাওড়া শক্ত কাঠামোর চেহারা। ঠিক এইরকম চেহারার একটা লোকের বিবরণই সে পেয়েছে। যদি এই লোকটাই সে লোকটা হয়, তবে এর ক্ষমতা প্রায় সীমাহীন। বিবরণে আছে: লোকটা ঘণ্টায় একশো মাইল বা তার চেয়েও বেশি বেগে দৌড়োতে পারে। দশ ফুট বা তার চেয়েও উঁচুতে লাফাতে পারে।

লোকটা যে-কোনও পাহাড় ডিঙোতে পারে। যে-কোনও সমুদ্র পেরোতে পারে। শত্রু হিসেবে লোকটা অতি সাংঘাতিক। বন্ধু হিসেবে এ লোকটাকে পেলে যে-কেউ পৃথিবী জয় করতে পারে। এ লোকটা পৃথিবীর বন্ধু না শত্রু সেইটেই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

পঞ্চানন্দ খুবই চিন্তিত মুখে ফোকর থেকে চোখ সরিয়ে নিল। তারপর খুব সাবধানে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল। মাথাটা এই শীতেও বেশ গরম লাগছে তার। গায়ে বেশ ঘাম হচ্ছে।

বাড়ি ফিরে সে দেখল, খাওয়াদাওয়া প্রায় শেষ।

পঞ্চানন্দ আজ আর খাওয়া নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাল না। বস্তুত আজ সে রুই মাছের কালিয়া বা ছানার কোফতার তেমন স্বাদও পেল না। সবই এক রকম লাগল।

ঠাকুর বিনীতভাবে বলল, "আজ কি খিদেটা তেমন নেই বাবু?"

"না হে, রোজ কি আর খেতে ভাল লাগে?"

একুশ

হরিবাবু আজ বেশ উদ্বেলিত বোধ করছেন। সমঝদারের অভাবে এতদিন তাঁর কাব্যসাধনা একরকম বিফলেই যাচ্ছিল। এতদিন পর তিনি একজন ভাল সমঝদার পেয়েছেন। লোকটা হয়তো তেমন সাধু চরিত্রের নয়। একটু পেটুকও আছে। চোর গুণ্ডা বদমাশ হওয়াও বিচিত্র নয়। তবু বলতেই হবে যে, পঞ্চানন্দ লোকটা কবিতা বোঝে।

উৎসাহের চোটে হরিবাবু আজ রাত দেড়টা পর্যন্ত একনাগাড়ে কবিতার পর কবিতা লিখে চললেন। গিন্নি অনেকবার শোয়ার জন্য বললেন, বকাবকিও করলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। হরিবাবুর হৃদয় আজ ময়ূরের মতো এমন নাচতে লেগেছে, ঠ্যাং না-ভাঙা অবধি সেই নাচ থামবে না। বলে বলে ক্লান্ত হয়ে গিন্নি ঘুমিয়ে পড়লেন।

দেড়টার সময় হরিবাবুর খিদে পেল। রাত দশটা নাগাদ সামান্য একটু কোনওক্রমে গিলে আবার কবিতা লিখতে বসে গিয়েছিলেন। এখন পেট কুঁই-কুঁই করছে।

হরিবাবু কিছুক্ষণ ঘুমন্ত বাড়ির এধার-ওধার ঘুরে খাবার খুঁজলেন। কিন্তু কোথায় খাবারদাবার থাকে, তা তাঁর জানা নেই। ফলে কিছুই না পেয়ে পেট ভরে জল খেলেন। তারপর ভাবলেন, ছাদে গিয়ে খোলা হাওয়ায় একটু ঘুরে বেড়াবেন।

ব্যাপারটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে হরিবাবু ছাদে উঠলেন।

আহা, চারিদিকের কী শোভা! আকাশে চাঁদটা খুব ঝুলে পড়েছে। এত ঝুলে পড়েছে যে, বেশ বড়সড় দেখাচ্ছে চাঁদটাকে। আর চাঁদের রঙটাও বেশ ভাল লাগল হরিবাবুর। রোজকার মতো হলদে চাঁদ নয়। এ-চাঁদের

রংটা বেশ ফিকে নীল।

হরিবাবুর ইচ্ছে হল এখনই গিয়ে নীল চাঁদ নিয়ে একটা কবিতা লিখে ফেলেন।

কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে হল, চাঁদটা একটু নড়ল যেন! হ্যাঁ, চাঁদটা বাস্তবিকই আজ বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ আকাশ থেকে সড়াত করে বিঘত-খানেক নেমে এল।

হরিবাবু ঊর্ধ্বমুখ হয়ে চাঁদের এই কাণ্ড দেখে ভাবলেন, নড়ন্ত চাঁদ আর দুরন্ত ফাঁদে মিল কেমন জমবে?

উঁহু, চাঁদটা যে শুধু নীল আর নড়ন্ত তাই নয়। চাঁদটার সাইজটাও ভারী অন্যরকম। কেউ যেন দু'দিক দিয়ে খানিকটা করে চেঁছে চাঁদটাকে হুবহু একখানা হাঁসের ডিম বানিয়ে দিয়েছে। এরকম ডিমের মতো চাঁদ আগে কখনও দেখেননি হরিবাবু। তিনি বিড়বিড় করতে লাগলেন:

> এ কোন্ অদ্ভুত চন্দ্র বিম্বিত আকাশে?
> চাঁদ, না ঘুঘুর ডিম ভাসে?
> গগনের অশ্রু? নাকি স্বর্গের বাগানে রাজহাঁসে
> ডিম ভুলে ফিরেছে আবাসে?

কবিতাটি এক্ষুনি লিখে ফেলতে হবে। নইলে সংসারের নানা ঝামেলায় মাথা থেকে মুছে যাবে জিনিসটা। হরিবাবু তাই পড়ি কি মরি করে ছাদ থেকে নেমে এলেন এবং খাতায় লিখে ফেললেন কবিতাটি।

তারপর হঠাৎ হরিবাবুর একটা খটকা লাগল। চাঁদ কস্মিনকালেও নীল হয় না। চাঁদের আকার ডিমের মতো হওয়ারও সত্যিকারের কোনও কারণ নেই। আর চাঁদ আকাশে কখনওই এরকম বেমক্কা নড়াচড়া করে না।

তা হলে ব্যাপারটা কী হল? অ্যাঁ! হরিবাবু কলম রেখে আবার ছাদে উঠে এলেন। অবাক হয়ে দেখলেন, আকাশে চাঁদটা নেই, এমনকী আভাসটুকু পর্যন্ত নেই। ঘুটঘুটে আকাশে কুয়াশার জন্য তারাটারাও দেখা যাচ্ছে না।

হরিবাবু ভারী অবাক হয়ে চারদিকে চাঁদটাকে খুঁজতে লাগলেন। ছোটখাটো জিনিস নয় যে, হারিয়ে যাবে। এত তাড়াতাড়ি চাঁদটার অস্ত যাওয়ারও কথা নয়।

হরিবাবু খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে করতে আপন-মনেই বলে উঠলেন, "এটার মানে কী? অ্যাঁ! এর মানে কী?"

জলের ট্যাঙ্কের পাশে অন্ধকার ঘুপচি থেকে একটা ক্ষীণ গলা বলে উঠল, "আজ্ঞে, মানেটা বেশ গুরুচরণ।"

হরিবাবু আঁতকে উঠে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। অন্ধকারে কিছুই দেখার জো নেই। তবে জলের ট্যাঙ্কের দিক থেকে একটা কিম্ভূত ছায়ামূর্তি ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল।

হরিবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "কে? কে ওখানে?"

"আজ্ঞে চ্যাঁচাবেন না, আমি পঞ্চানন্দ।"

হরিবাবু একটা নিশ্চিন্তের শ্বাস ছেড়ে একটু হেসে বললেন, "ওঃ পঞ্চানন্দ? তা ইয়ে, বুঝলে, একখানা এইমাত্র লিখে ফেললুম। শুনবে নাকি?"

পঞ্চানন্দ বেশ ঝুব্বুস করে কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে আছে। বেশ অমায়িক ভাবেই বলল, "আপনার কি শীতও করে না আজ্ঞে? গায়ে একখানা পাতলা চাদর দিয়ে কী করে এই বাঘা শীত সহ্য করছেন?"

হরিবাবু উদাস হেসে বললেন, "করবে না কেন, করে। তবে কিনা কবিতারও তো একটা উত্তাপ আছে। মাথাটা বেশ গরম হয়ে উঠেছিল একটু আগে।"

"সে না হয় বুঝলুম, কিন্তু চোখের সামনে এত বড় একটা ভুতুড়ে কাণ্ড দেখেও আপনার শুধু কবিতা মাথায় আসে কেন বলুন তো!"

হরিবাবু অবাক হয়ে বললেন, "ভুতুড়ে কাণ্ড! কী রকম ভুতুড়ে কাণ্ড বলো তো!"

"এই যে চোখের সামনে আকাশ থেকে যে বস্তুটাকে নেমে আসতে দেখলেন, সেটা ভুতুড়ে ছাড়া আর কী হতে পারে বলুন দিকি!"

হরিবাবু খুব হাসলেন। তারপর বললেন, "চাঁদটা দেখে ভয় পেয়েছ বুঝি? আমিও একটু অবাক হয়েছিলাম।"

পঞ্চানন্দ অবাক হয়ে বলল, "চাঁদ? আপনার কি তিথিটাও খেয়াল নেই? আজ কি আকাশে চাঁদ থাকার কথা?"

হরিবাবু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "সে অবিশ্যি ঠিক।"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলল, "মোটেই ঠিক নয়। এসব ব্যাপার খুবই গোলমেলে। এ-নিয়ে একটু ভাবা দরকার।"

হরিবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, একটু ভাবলেও হয়।"

পঞ্চানন্দ একখানা হাই তুলে বলল, "আমার মুশকিল কী জানেন? পেট খালি থাকলে মাথাটা মোটেই খেলতে চায় না।"

হরিবাবু এতক্ষণ খিদের কথা ভুলে ছিলেন। হঠাৎ পঞ্চানন্দের কথায় তাঁর পেটটাও খাঁ-খাঁ করে উঠল। মাথা চুলকে বললেম, "খিদে জিনিসটা বোধহয় ছোঁয়াচে। আমারও বোধহয় একটু পাচ্ছে।"

'বোধহয়' শুনে পঞ্চানন্দ চোখ কপালে তুলে বলল, "ধন্য মশাই আপনি! খিদের ব্যাপারেও আবার বোধহয়?"

হরিবাবু লাজুক হেসে বললেন, "অনেকক্ষণ ধরেই বোধহয় খিদেটা পেয়ে আছে। কিন্তু খাবার-টাবার কিছুই ঘরে নেই দেখলাম।"

পঞ্চানন্দ একগাল হেসে বলল, "নেই মানে? আজ্ঞে, খাওয়ার ঘরের ঠাণ্ডা আলমারিতে এক ডেকচি নতুন গুড়ের পায়েস, এক বাটি রসগোল্লা, ছানার গজা, মাছের কালিয়া আর কয়েকখানা পরোটা রয়েছে। অবশ্য গিন্নি-মা ফ্রিজে চাবি দিয়ে রাখেন। কিন্তু তাতে কী?"

হরিবাবুর মাথায় ফ্রিজের কথাটা খেলেনি। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন, "তুমি বাস্তবিকই প্রতিভাবান।"

দু'জনে নিঃশব্দে নেমে এলেন। পঞ্চানন্দ ঠিক এক মিনিটে ফ্রিজের দরজা খুলে খাবার-দাবার বের করে ফেলল। খেতে-খেতে দু'জনের কথা হতে লাগল।

হরিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ, চাঁদ নিয়ে কী যেন বলছিলে!"

পঞ্চানন্দ এক কামড়ে আধখানা মাছ উড়িয়ে দিয়ে বলল, "চাঁদ নয়, চাঁদ হলে ওরকম বেয়াদবি করত না।"

"তা হলে জিনিসটা কী?"

"মনে হয় এ হল গগন-চাকি।"

হরিবাবু খুব বিরক্ত হয়ে বলল, "গগন চাকি? সে তো কামারপাড়ার দিকে থাকে, তার পাটের ব্যবসা! সে এর মধ্যে আসে কী করে?"

পঞ্চানন্দ পরোটা ঝোলে ডুবিয়ে খেতে-খেতে বলল, "আজ্ঞে, সে গগন চাকি নয়। গগন মানে আকাশ আর চাকি হল গোলাকার বস্তু। উড়ন্ত-চাকিও বলতে পারেন।"

"উড়ন্ত-চাকি? সে তো এক দুরন্ত ফাঁকি। শুনেছি উড়ন্ত-চাকি বলে আসলে কিছু নেই। নিষ্কর্মা লোক ওসব গুজব রটায়!"

পঞ্চানন্দ দুটি রসগোল্লা দু'গালে ফেলে নিমীলিত নয়নে অনেকক্ষণ চিবোল। তারপর বলল, "লোকে কত কী বলে। ওসব কথায় কান দেবেন না। যখন হিমালয়ে ছিলুম তখন খাড়াবাবার কাছে পরামর্শ নিতে বার-দুনিয়া থেকে কত কিম্ভূত চেহারার জীব আসত। তারা আসত ওইসব উড়ন্ত-চাকিতে করেই। কোনওটা চ্যাপটা, কোনওটা বলের মতো গোল, কোনওটা আবার পটলের মতো লম্বাপানা। একবার আপনাদের পিছনের বাগানেও একটা নেমেছিল। তখন শিবুবাবু বেঁচে। কয়েকটা লোমওয়ালা হুমদো গোরিলা একখানা মস্ত পিপের মতো বস্তু থেকে বেরিয়ে গটগট করে গিয়ে শিবুবাবুর ল্যাবরেটরির দরজায় ধাক্কা দিল। আমি বারান্দায় শুয়ে চোখ মিটমিট করে সব দেখছিলাম।"

হরিবাবু এক চামচ পায়েস মুখে দিয়ে সেটা গিলতে ভুলে গিয়ে চেয়ে রইলেন।

পঞ্চানন্দ সস্নেহে বলল, "গিলে ফেলুন হরিবাবু, নইলে বিষম খাবেন যে!"

হরিবাবু পায়েসটা গিলে বললেন, "তারপর?"

"ভিতরে কী সব কথাবার্তা হল বুঝলাম না। তবে একটু বাদে দেখি, শিবুবাবু সেই গোরিলাগুলোর সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছেন। যাওয়ার সময় আমাকে বলে গেলেন, 'ওরে পঞ্চা, এই এদের সঙ্গে একটু আকাশের অন্য দিকে যেতে হচ্ছে। এদের গ্রহে একটা যন্ত্র একটু খারাপ হয়েছে। মেরামত করে দিয়ে আসতে হবে। ক'দিন বাদে ফিরব।' তা বাস্তবিকই সেই পিপেটায় গিয়ে উঠলেন শিবুবাবু। আর তারপর সেটা একটা গোঁ-ও-ও শব্দ করে একটা

গড়ুরের মতো ছিটকে আকাশে উঠে গেল।"

হরিবাবু দম বন্ধ করে শুনছিলেন। বললেন, "তারপর?"

"আজ্ঞে, তাই বলছিলাম, গগন-চাকি কিছু মিছে কথা নয়। আমার তো মনে হচ্ছে আজ যেটা দেখা গেল সেটাও ওই গগন-চাকিই।"

হরিবাবু আনমনে বিড়বিড় করতে লাগলেন :

আকাশের ডিম, নাকি গগনের চাকি মর্ত্যধামে?
কিছু তার কল্পনা, কিছু তার ফাঁকি, মধ্যযামে।

বলতে বলতে হরিবাবু গায়ের চাদরে ঝোল আর রসগোল্লার রস-লাগা হাত মুছতে-মুছতে নিজের ঘরে গিয়ে কবিতাটা লিখতে বসে গেলেন।

পঞ্চানন্দ ধীরেসুস্থে খাওয়া সেরে উঠল। মুখ ধুয়ে ধীরে-ধীরে নীচে নেমে হরিবাবুর ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিল সে। তারপর আলো জেবলে নিজেই একটা পান সেজে খেল। তারপর বালিশের তলা থেকে চাবির গোছাটা বের করে টর্চটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল সে।

আকাশ থেকে ডিমের মতো বস্তুটা যখন নেমে এসেছিল অনেকটা, তখনই হঠাৎ সেটার গায়ের নীল আলো নিবে গিয়েছিল। বস্তুটা যে ধারে-কাছে কোথাও নেমেছে তাতে পঞ্চানন্দের সন্দেহ নেই। কিন্তু ঠিক কোথায় নেমেছে সেটাই সে ঠাহর করতে পারেনি।

ফটক খুলে রাস্তায় পা দিয়ে পঞ্চানন্দ চারপাশটা সতর্ক চোখে একটু দেখে নিল। কেউ কোথাও নেই।

তারপর বেশ পা চালিয়ে হাঁটতে লাগল সে।

পঞ্চানন্দ যে একাই বস্তুটাকে নামতে দেখেছে তা নয়। আর-একজন ঘড়েল লোকও দেখেছে। এই লোকটা খুব সাধারণ লোক নয়। চকসাহেবের বাড়িতে গা-ঢাকা দিয়ে আছে বটে, কিন্তু তার সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিতে দুনিয়ার সব কিছুই ধরা পড়ে যায়।

পঞ্চানন্দ তাই খুব চিন্তিতভাবে এগোতে লাগল।

বাইশ

কোথায় বস্তুটা নেমেছে সে সম্পর্কে পঞ্চানন্দর একটা আন্দাজ ছিল মাত্র। তবে নামবার মুহূর্তে আলো নিবিয়ে দেওয়ায় সঠিক নিশানা সে ধরতে পারেনি। তবে চক-সাহেবের বাড়ির দিকটাই হবে। পঞ্চানন্দ খুব দৌড়-পায়ে হেঁটে যখন চক-সাহেবের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছল তখন তার সবটুকু মনোযোগ সামনের দিকে। ফলে পিছন দিন থেকে যে বিপদটা আসছিল, সেটা সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না তার। রাস্তা থেকে চক-সাহেবের বাড়ির দিকে যাওয়ার একটা পরিত্যক্ত ভাঙা রাস্তা আছে। দু'ধারে মস্ত মস্ত বাবলাগাছ, কাঁটা-ঝোপ, ঘাস-জঙ্গল। সেই রাস্তার মোড়ে একজন অতিকায় ঢ্যাঙা লোক একটা ঝোপের আবডালে দাঁড়িয়ে হাতে একটা ক্যামেরার মতো বস্তুতে কী যেন দেখছিল,

পঞ্চানন্দ যতই নিঃসাড়ে আসুক লোকটা ঠিকই টের পেল তার আগমন। টপ করে অন্ধকারে আরও একটু সরে দাঁড়াল সে। পঞ্চানন্দ যখনই ভাঙা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল, তখনই বেড়ালের মতো তার পিছু নিল ঢ্যাঙা লোকটা।

চক-সাহেবের বাড়ির পিছনে প্রকাণ্ড মাঠ। খানাখন্দে ভরা, পুরনো মজা পুকুর, ঝোপঝাড়, জলা জমির এই মাঠে লোকজন বড় একটা আসে না। চাষবাসও নেই। মাঝেমধ্যে গোরু চরাতে রাখাল-ছেলেরা আসে মাত্র। সন্ধের পর এখানে আলেয়া দেখা যায়।

পঞ্চানন্দ চক-সাহেবের বাড়ি পিছনে ফেলে দ্রুত পায়ে মাঠটার দিকে হাঁটছিল। হঠাৎ কেন যেন তার মনে হল, সে একা নয়। মনে হতেই সে পিছু ফিরে চাইল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। সন্তর্পণে টর্চটা একবার জ্বালল সে। পরমুহূর্তেই নিবিয়ে দিল।

ঢ্যাঙা লোকটা তার চেয়ে কম সেয়ানা নয়। একটা নিরাপদ দূরত্বে থেকে সে যন্ত্রের ভিতর দিয়ে লক্ষ রাখছিল পঞ্চানন্দকে। পঞ্চানন্দ টর্চ জ্বালবার আগেই একটা গাছের আড়ালে সরে গেল সে।

পঞ্চানন্দ একটু দ্বিধাগ্রস্ত হল। সে জানে যে-সব অজানা মানুষ বা অমানুষের সঙ্গে তাকে পাল্লা দিতে হচ্ছে, তারা খুবই তুখোড় এবং শক্তিমান। চক-সাহেবের বাড়িতে যে-লোকটি স্যাঙাত নিয়ে থানা গেড়েছে সে বড় সে-সে লোক নয়। পঞ্চানন্দকে ইচ্ছে করলে বায়ুভূত করে দিতে পারে যে কোনও সময়ে।

সুতরাং পঞ্চানন্দ একটু সাবধান হল। খোলা জায়গা এড়িয়ে ঝোপঝাড় খুঁজে আড়াল হয়ে একটু একটু করে এগোতে লাগল।

সামনে অন্ধকার বিশাল মাঠ। কিছুই দেখা যায় না। কুয়াশায় সব কিছু এক ঘেরাটোপে ঢাকা। খুব আবছা এক ধরনের আভাস মাত্র পাওয়া যাচ্ছে।

দপ করে আলেয়ার একটা নীল শিখা জ্বলে উঠে বাতাসে খানিক দোল খেয়ে নিবে গেল। ফের একটু দূরে আর একটা জ্বলে উঠল।

আলেয়া দেখে পঞ্চানন্দ আন্দাজ করল যে, ওদিকটায় জলা। সাধারণত জলা-জমিতেই আলেয়া দেখা যায়।

পঞ্চানন্দ আর এগোল না। একটা বড়সড় ঝোপ দেখতে পেয়ে আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে খুব তীক্ষ্ন নজরে জলাটা দেখতে লাগল। গগন-চাকি যদি এখানে নেমে থাকে তবে জলার আশেপাশেই নেমেছে।

কিন্তু অনেকক্ষণ চেয়ে থেকেও কিছুই ঠাহর করতে পারল না সে। তবে সে ধৈর্যশীল মানুষ। চুপচাপ বসে চোখকে যতদূর তীক্ষ্ন করা যায় করে চেয়ে রইল।

খুব ক্ষীণ একটা আলো দেখা গেল কি? বাঁ ধারে ওই যেখানে খুব তুঁতেগাছ জন্মায়। হ্যাঁ, ওই দিকটায় একটা যেন নীলচে মতো আলো ফুটে উঠছে।

একটু ঝুঁকে সামনের ঝোপটা হাত দিয়ে সরিয়ে পঞ্চানন্দ দেখার চেষ্টা করল।

একেবারে নিঃশব্দে লম্বা ঢ্যাঙা একটা ছায়া এগিয়ে এল পিছন দিক থেকে। পঞ্চানন্দ টেরও পেল না। ঢ্যাঙা লোকটার হাতে টর্চের মতো একটা বস্তু। কিন্তু সেটা টর্চ নয়। লোকটা যন্ত্রটা তুলে একটা সুইচ টিপল।

কিছু টের পাওয়ার আগেই পঞ্চানন্দ লটকে পড়ল মাটিতে। অবশ্য ঝোপ-ঝাড়ের জন্য পুরোটা মাটিতে পড়ল না সে। লটকে রইল মাঝপথে।

ঢ্যাঙা লোকটা যেন একটু দুঃখিতভাবেই চেয়ে রইল পঞ্চানন্দের নিথর দেহটার দিকে। তারপর দূরবিনের মতো যন্ত্রটা তুলে একটা বোতাম টিপল।

যন্ত্রের ভিতরে একটি কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করল, "সব ঠিক আছে?"

ঢ্যাঙা লোকটা মৃদু স্বরে বলল, "একজন লোক এদিকে এসেছিল। মনে হয় মজা দেখতে। তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি।"

"লোকটার শরীর ভাল করে সার্চ করে দ্যাখো। টিকটিকিও হতে পারে।"

"দেখছি।"

ঢ্যাঙা লোকটা খুব দ্রুত এবং দক্ষ হাতে পঞ্চানন্দর পকেট ট্যাঁক হাতড়ে দেখে নিল। তেমন সন্দেহজনক কিছু পেল না।

যন্ত্রের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "কিছু নেই।"

"জলার দিকে লক্ষ্য রেখেছ?"

"হ্যাঁ। এখনও মুভমেন্ট কিছু দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে এটা একটা অ্যাডভান্স সার্চ পার্টি। প্রাথমিক খোঁজখবর নিতে নেমেছে।"

"লক্ষ্য রাখো। বেশি কাছে যেও না। আমার ধারণা যন্ত্রটার মধ্যে কোনও জীব নেই। শুধু যন্ত্রপাতি আর যন্ত্রমানব আছে। জীব থাকলে আমার স্ক্যানারে ধরা পড়ত।"

"আমি লক্ষ্য রাখছি।"

"আকাশে যন্ত্রটাকে আরও কেউ-কেউ দেখে থাকতে পারে। যদি দেখে থাকে তবে তারাও হয়তো এদিকে আসবে। নজর রেখো। কাউকেই জলার দিকে তুঁতেবনে যেতে দিও না।"

"আচ্ছা।"

ঢ্যাঙা লোকটা সুইচ টিপে হাতের যন্ত্রটাকে অন্য কাজে নিয়োগ করল। চার দিকের নিকটবর্তী আবহমণ্ডলে কোনও মানুষ ঢুকলেই যন্ত্র তাকে খবর দেবে।

ঢ্যাঙা লোকটা বিরক্ত হয়ে দেখল, যন্ত্রটা সংকেত দিচ্ছে। অর্থাৎ অন্য কোনও মানুষ কাছাকাছি এসেছে। ঢ্যাঙা লোকটা একটু আড়ালে সরে গেল এবং চোখে দূরবিনের মতো আর একটা যন্ত্র লাগিয়ে অন্ধকারেও চারদিকটা দেখতে লাগল।

নিশুত রাত্রে তিনটে ছায়ামূর্তি জলের দিকে এগিয়ে আসছিল। তিনজনেরই হোঁতকা চেহারা। একটু দুলে দুলে তারা হাঁটে। তবে চেহারা দশাসই হলেও তারা হাঁটে বেশ চট্‌পটে পায়ে। তেমন কোনও শব্দও হয় না।

জলার দক্ষিণ দিকে মাইল-তিনেক দূরে একটা মস্ত ঢিবি আছে। ঢিবির চারদিকে বহুদূর অবধি জনবসতি নেই। অত্যন্ত কাঁকুরে জমি, ঘাস অবধি হয় না। তারই মাঝখানে ওই ঢিবি। লোকে বলে ঢিবির মধ্যে পুরনো রাজপ্রাসাদ আছে। সেটা নেহাতই কিংবদন্তী।

তবে ওই ঢিবির গায়ে বেশ বড়সড় কয়েকটা গর্ত হয়েছে ইদানীং। রাখাল-ছেলেদের মধ্যে কেউ-কেউ সেইসব গর্ত লক্ষ্য করেছে বটে, কিন্তু তারা কেউ সে-কথা আর পাঁচজনকে বলার সুযোগ পায়নি। কারণ যারাই ঢিবিটার কাছে-পিঠে গেছে, তাদেরই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা পর কোনও গাঁয়ের ধারে পাওয়া গেছে। জ্ঞান ফিরে আসার পরও তারা আর স্বাভাবিক স্মৃতিশক্তি ফিরে পায়নি। আবোলতাবোল বকে আর বিড়বিড় করে। সুতরাং ঢিবির গায়ে গর্তের কথা কেউ জানতে পারেনি।

সেই ঢিবি থেকেই একটি গর্তের মুখ দিয়ে তিনটে ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এসেছে। খুব নিশ্চিন্তে জলার দিকে হাঁটছে তারা। নিচু এক ধরনের গোঙানির স্বরে তারা মাঝে-মাঝে সংক্ষিপ্ত দু-একটা কথাও বলছে। কিন্তু সে ভাষা বোঝার ক্ষমতা কোনও মানুষের নেই।

জলার কাছ-বরাবর এসে তিনজন একটু দাঁড়াল। একজন একটা ছোট্ট পিরিচের মতো জিনিস বের করে সেটার দিকে চাইল। অন্য দু'জন একটু মাথা নাড়ল। পিরিচের মধ্যে তারা কী দেখল কে জানে, তবে তিনজনেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল।

ঢ্যাঙা লোকটা তার দূরবিনের ভিতর দিয়ে অন্ধকারে তিনজনকে স্পষ্ট দেখতে পেল। তাদের হাতের পিরিচটাও লক্ষ্য করল সে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে টর্চের মতো যন্ত্রটাকে তুলে পর পর কয়েকবার সুইচ টিপল।

তিনজন অতিকায় জীব হঠাৎ থমকে দাঁড়াল জলার ওপাশে। তিনজনই একটু কেঁপে উঠল। কিন্তু পঞ্চানন্দের মতো তারা লটকে পড়ল না।

হঠাৎ একটা ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল তিনজন একসঙ্গে। তারপর চিতাবাঘের মতো চকিত পায়ে তারা এক লহমায় জলটা পার হয়ে দৌড়ে এল এদিকে।

ঢ্যাঙা লোকটা ভাল করে নড়বারও সময় পেল না। তিনটে অতিকায় জীব তার ওপর লাফিয়ে পড়ল তিনটে পাহাড়ের মতো।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঢ্যাঙা লোকটাকে তারা শেষ করে ফেলত। কিন্তু লোকটা অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো হাতের টর্চটা তুলে ঘন ঘন সুইচ টিপতে লাগল।

তাতে ব্যাপারটা একটু বিলম্বিত হল মাত্র। তিনটে দৈত্যের মতো জীব

ততটা বিক্রমের সঙ্গে না হলেও, অমোঘভাবে এগিয়ে আসতে লাগল তার দিকে। অবশেষে একজন হঠাৎ ঢ্যাঙা লোকটাকে ধরে মাথার ওপর তুলে একটা ডল-পুতুলের মতো আছাড় দিল মাটিতে।

ঢ্যাঙা লোকটা চিতপাত হয়ে পড়ে রইল।

তিনটে অতিকায় জীব দ্রুত পায়ে জলার ওদিকে তুঁতেবনের দিকে এগিয়ে গেল।

তেইশ

জলার ধারে ঢিবির কথা গজ-পালোয়ান ভালই জানত, ঢিবিটার কোনও বৈশিষ্ট্য সে কখনও লক্ষ্য করেনি। বাইরে থেকে দেখলে সেটাকে একটা ছোটখাটো টিলা বলেই মনে হয়। এর মধ্যে একখানা আস্ত রাজবাড়ি চাপা পড়ে আছে বলে যে কিংবদন্তী শুনেছে সে, তা গজ বিশ্বাস করে না।

কিন্তু আজ এই নিশুত রাতে এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে তাকে কথাটা বিশ্বাস করতে হচ্ছে।

সেদিন চকসাহেবের বাড়ি থেকে পালিয়ে ন্যাড়াদের বাড়িতে শিবুবাবুর ল্যাবরেটরিতে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকেই এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল যার মাথা-মুণ্ডু সে কিছু বুঝতে পারছে না।

ল্যাবরেটরির দরজা বন্ধ করে জানালার পর্দাগুলো ভাল করে টেনেটুনে সে একটু ঘরটা ঘুরে-ঘুরে দেখছিল। নিজের কাছে লুকিয়ে তো লাভ নেই, শিবুবাবুর ল্যাবরেটরিতে একটা জিনিস সে অনেকদিন ধরেই খুঁজছে। এতদিন গোপনে চোরের মতো মাঝরাতে ঢুকে খুঁজেছে, আর সেদিন আলো জ্বেলে বেশ নিশ্চিন্ত মনেই খুঁজছিল। কিন্তু যে জিনিসটা সে খুঁজছিল, সেটা সম্পর্কে তার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। যতদূর জানে, জিনিসটা একটা টেনিস বলের মতো ধাতব বস্তু। খুবই আশ্চর্য বস্তু সন্দেহ নেই, কিন্তু তার ভিতরকার কথা তার জানা নেই। সে শুধু জানে দুনিয়ায় ওরকম বস্তু দ্বিতীয়টি নেই। পাগলা শিবুবাবু সেই বস্তুটা নিজেই বানিয়েছেন না কারও কাছ থেকে পেয়েছেন তাও রহস্যময়। তবে ওই টেনিস বলের জন্য দুনিয়ার বহু জানবুঝওয়ালা লোক পাগলের মতো হন্যে হয়ে ঘুরছে।

বস্তুটা যে ল্যাবরেটরিতেই আছে তা নাও হতে পারে। কিন্তু কোথাও তো আছেই। ল্যাবরেটরিটাই সবচেয়ে সম্ভাব্য জায়গা। আর শিবুবাবুর ল্যাবরেটরিতে এত আলমারি, ড্রয়ার, তাক, গুপ্ত খোপ, মেঝের নীচে পাতালঘর আর পাটাতনে গুপ্ত কক্ষ আছে যে সে এক গোলকধাঁধা। খুঁজতে-খুঁজতে মাথা গুলিয়ে যায়, হাঁফ ধরে, ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে থাকে।

সেদিন গজ'রও সেরকমই হচ্ছিল। বস্তুটার একটা হদিস করতে পারলেই গজ এ শহরের পাট চুকিয়ে কেটে পড়তে পারে। হাতেও মেলা টাকা এসে যাবে।

আশ্চর্যের বিষয় এই, শিবুবাবুর কাছে যে ওরকম মূল্যবান একটা দরকারি জিনিস আছে, তা তাঁর ছেলেপুলেরা কেউ জানে না। শিবুবাবুর ছেলেগুলো যাকে বলে হাঁদাগঙ্গারাম। একজন কেবল মাথামুণ্ডু পদ্য লিখে কাগজ নষ্ট করে। একজন গাধাটে গলায় তানা-না-না করে সকলের মাথা ধরিয়ে দেয়। ছোটটা কেবল শরীর বাগাতে গিয়ে মাথাটা গবেট করে ফেলছে। এর ফলে আর পাঁচজনের সুবিধেই হয়েছে।

গজ যখন একটার পর একটা ড্রয়ার খুলে হাতড়ে দেখছিল তখন একসময়ে দরজায় খুব মৃদু একটা টোকার শব্দ হল। একটু আঁতকে উঠলেও গজ খুব ঘাবড়াল না। সম্ভবত ন্যাড়া তাঁর খোঁজখবর নিতে এসেছে।

দরজার কাছে গিয়ে গজ সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করল, "কে, ন্যাড়া নাকি?"

ন্যাড়া যে নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল পর মুহূর্তেই। গজ দেখল দরজার দুটো পাল্লার ফাঁক দিয়ে লিক্‌লিকে শিকের মতো একটা জিনিস ঢুকছে। আর শিকটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো নিপুণভাবে ওপরে বেঁকে ছিট্‌কিনি খুলে ফেলল, খাটমটাও নামিয়ে দিল। ঘটনাটা ঘটল চোখের পলক ভাল করে ফেলার আগেই।

গজ নিরুপায় হয়ে দরজাটা চেপে ধরে রেখেছিল কিছুক্ষণ। তার গায়ে আসুরিক শক্তি। গায়ের জোরে সে অনেক অঘটন ঘটিয়েছে।

কিন্তু এ-যাত্রায় গায়ের জোর কাজে লাগল না। ওপাশ থেকে যেন একটা হাতি তাকে সমেত দরজাটাকে ঠেলে খুলে ফেলল।

গজ মেঝেয় ছিটকে পড়েছিল। চোখ চেয়ে যা দেখল, তা অবিশ্বাস্য। হাতিই বটে, তাও একটা নয়, তিনটে। এরকম অতিকায় চেহারার মানুষ সে কখনও দেখেনি। গোরিলার মতোই তাদের চেহারা, তবে রোমশ নয়। পরনে অদ্ভুত জোব্বার মতো পোশাকও আছে। তবে মানুষ তারা হতেই পারে না।

তিনজনেই তাকে কুত্‌কুতে চোখে একটু দেখে নিল। তারপর দুর্বোধ কয়েকটা শব্দ করল মুখে। ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল তার দিকে।

গজ বুঝল, তার বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তা বলে সে শেষ চেষ্টা করতে ছাড়ল না। একটা লাফ দিয়ে উঠে সে সামনের গোরিলাটাকে একখানা পেল্লায় জোরালো ঘুষি ঝাড়ল। সোজা নাকে। তারপর আরও একটা। আরও একটা।

গোরিলার মতো চেহারার লোকটা কিন্তু ঘুষি খেয়ে একটু টলে গিয়েছিল। মাথটা চেপে ধরে একটা কাতর শব্দও করেছিল।

অন্য দু'জন নীরবে দৃশ্যটা দেখে খুব নির্বিঘ্নে এবং নিশ্চিন্ত মুখেই দু'ধার থেকে বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে এল গজ'র দিকে।

গজ ক্রমাগত ঘুষি চালিয়ে যাচ্ছিল ঝড়ের গতিতে। একবার সে ধোবিপাটে আছাড় দেওয়ার জন্য ডান ধারের দানোটাকে জাপটে ধরে তুলেও ফেলেছিল

খানিকটা। কিন্তু অত ভারী শরীর শেষ অবধি তুলতে পারেনি।

দানোগুলো কিন্তু তার সঙ্গে লড়েনি। কিছুক্ষণ তাকে নিরস্ত্র করবারই চেষ্টা করেছিল। তারপর যেন একটু বিরক্ত হয়েই একটা দানো একটা চড় কষাল তাকে।

গজ সেই যে মাথা ঝিমঝিম্ করে পড়ে গেল তারপর আর জ্ঞান রইল না কিছুক্ষণ।

একসময়ে টের পেল দানোগুলো তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছে।

যখন ভাল করে জ্ঞান ফিরল তখন গজ দেখল, সে একটা অদ্ভুত জায়গায় শুয়ে আছে। ঘর বললে ভুল বলা হবে, অনেকটা যেন সুড়ঙ্গের মতো। আবার ইঁটের গাঁথনিও আছে খানিকটা। বিছানা নয়, তবে একটা নরম গদির মতো কিছুর ওপর সে শুয়ে। মুখের ওপর একটা আলো জ্বলছে। বেশ স্নিগ্ধ আলো। কিন্তু আলোটা ইলেকট্রিক বা তেলের আলো নয়। গজ পরে পরীক্ষা করে দেখেছে একটা বেশ নারকোলের সাইজের পাথর থেকে ওই আলো আপনা-আপনি বেরিয়ে আসছে।

জ্ঞান ফেরার কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা দানো এসে তাকে ভাল করে আপাদমস্তক দেখল। দুর্বোধ ভাষায় কী একটা বলল। তারপর কোথা থেকে নানা যন্ত্রপাতি এনে তার শরীরে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে কী যেন পরীক্ষা করতে লাগল।

জায়গাটা কোথায় তা গজ বুঝতে পারছিল না। তবে মাটির নীচে কোথাও হবে। ইঁটের গাঁথনির ফাঁকে ফাঁকে মাটি দেখা যাচ্ছে। সোঁদা গন্ধও পাওয়া যাচ্ছিল।

ঘণ্টাখানেক বাদে একটা দানো তাকে কিছু খাবার এনে দিল। এরকম খাবার গজ জন্মেও খায়নি বা দ্যাখেনি। সবুজ-মতো চটকানো একটা ডেলা, সঙ্গে রক্তের মতো একটা পানীয়। যে ধাতুপাত্রে খাবার দেওয়া হল তা সোনার মতো উজ্জ্বল।

খিদে পেয়েছিল বলে গজ বিস্বাদ মুখ করে সেই খাবার মুখে দিয়ে কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গেল। এত সুন্দর সেই খাবারের স্বাদ যে সমস্ত শরীরটাই যেন চনমনে খুশিয়াল হয়ে ওঠে। পানীয়টিও ভারী সুস্বাদু, বুক ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

খেয়ে গায়ে একটু জোর পেল গজ। উঠে বসল। একটু হাঁটাহাঁটি করল। দেখল, তাকে সুড়ঙ্গে আটকে রাখার জন্য কোনও আগল বা দরজা নেই। ইচ্ছে করলেই সে বেরোতে পারে।

কিন্তু বেরোতে গিয়েই ভুলটা ভাঙল। সুড়ঙ্গের চওড়া দিকটায় ঠিক কুড়ি পা গিয়েই একটা ধাক্কা খেল গজ। সমস্ত শরীরে একটা তীব্র বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল। ছিটকে সরে এসে গজ অনেকক্ষণ ধরে ধাক্কাটা সামলাল। বুঝল, এরা এমন ব্যবস্থা করেছে যাতে বাতাসে সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক বিক্রিয়া ছড়িয়ে থাকে

পর্দার মতো।

দানো-তিনটে পর্যায়ক্রমে এসে মাঝে-মাঝে নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে তাকে পরীক্ষা করে আর দুর্বোধ ভাষায় কী যেন বলে। তাদের ভাষা না বুঝলেও গজ এটা টের পায় যে, তাকে নিয়ে দানো তিনটে একটা রিসার্চ চালাচ্ছে। হয়তো পৃথিবীর প্রাণী সম্পর্কেই সেই রিসার্চ। দানো তিনটে যে পৃথিবীর প্রাণী নয় এ বিষয়ে গজ'র আর কোনও সন্দেহ নেই।

সুড়ঙ্গের মধ্যে যেটুকু পরিসর তাকে দেওয়া হয়েছে, তাতে বিচরণ করে গজ বুঝতে পেরেছে, এটা বাস্তবিকই মাটির নীচেকার কোনও ধ্বংসস্তূপ। মাঝে-মাঝে বাইরে থেকে মৃদু একটা জলীয় বাষ্প বয়ে যায় ভিতরে। অর্থাৎ কাছা-কাছি জলাভূমি আছে।

গজ আন্দাজ করল, জলার পাশে হয়তো সেই রাজবাড়ির ঢিবিটার গর্ভেই তাকে আটকে রাখা হয়েছে।

গজ লক্ষ্য করল, তিনটে দানোর হাতেই মাঝে-মাঝে পিরিচের মতো একটা জিনিস থাকে। খুবই উন্নত মানের পিরিচ সন্দেহ নেই। ওইটে হাতে নিয়েই ওরা বৈদ্যুতিক বেড়াজালটা দিব্যি ভেদ করে আসতে পারে।

গজ হিসেব করে দেখল, টানা দু'দিন দু'রাত্রি সে দানোদের হাতে বন্দী। দিনরাত্রির তফাত অবশ্য এখান থেকে বোঝা যায় না। শুধু এই উজ্জ্বল পাথরের আলো ছাড়া দিনরাত আর কোনও আলো নেই। মাঝে-মাঝে গজ'র মনে হয় সে দুঃস্বপ্নই দেখছে। আর কিছু নয়।

আজ হঠাৎ গজ'র ঘুমটা মাঝরাতে ভেঙে গেল। সে উঠে বসল। তারপর কেন ঘুম ভাঙল তা অনুসন্ধান করতে চারদিকে একটু ঘুরে বেড়াল সে। আর হঠাৎই টের পেল, সুড়ঙ্গের এক ধারে বিদ্যুতের বাধাটা আজ নেই।

গজ খুব সন্তর্পণে এগোতে লাগল।

চব্বিশ

গজ সুড়ঙ্গ পেরিয়ে বাইরে উঁকি মেরে দেখল, যা ভেবেছি তাই। সামনে কুয়াশা আর অন্ধকারেও জলটা আবছা দেখা যাচ্ছে। এ সেই রাজবাড়ির ঢিবিই বটে! সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে গজ একটুক্ষণ পরিষ্কার বাতাসে শ্বাস নিল। এখন ইচ্ছে করলেই সে পালাতে পারে।

কিন্তু পালানোর আগে গুহাটা একটু দেখে নেওয়া দরকার। এরা কারা, কী চায় বা কী অপকর্ম করছে তা না জেনে পালিয়ে গেলে চিরকাল আপশোস থাকবে।

ধরা পড়লে কী হবে, তা গজ'র মাথায় এল না। সাহসী লোকেরা আগাম বিপদের কথা ভাবে না, হাতে যে কাজটা রয়েছে সেটার কথাই ভাবে।

গজ ফের সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে দেখল বাঁ ধারে আর ডান ধারে দুটো পথ গেছে। বাঁ ধারে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, ওদিকে বিশেষ কিছু নেই।

ডান ধারের পথটা একটুখানি গিয়েই বাঁক খেয়েছে।

সে-পথে হাঁটতে গজ'র কোনও অসুবিধে হল না, কারণ মাথার ওপর একটু দূরে দূরে সেই আলো-পাথর ঝোলানো। এরকম আশ্চর্য পাথর পৃথিবীর লোক চোখেও দ্যাখেনি। গজ প্রত্যেকটা পাথরই ছুঁয়ে দেখল। ঠান্ডা, নেড়ে দেখল, সেগুলো বজ্র-আঁটুনিতে আটকানো রয়েছে। খোলার উপায় নেই।

সুড়ঙ্গটা ক্রমে চওড়া হচ্ছিল আর নীচে নেমে যাচ্ছিল। যখন শেষ হল, তখন গজ দেখল বেশ প্রশস্ত একখানা ঘর, একসময়ে যে ঘরখানা রাজবাড়ির ঘর ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। শ্বেতপাথরের মেঝে, কারুকার্য-করা পাথরের দেয়াল। ঘরে অবশ্য রাজকীয় কোনও জিনিসপত্র নেই। আছে নানারকম বিদঘুটে যন্ত্রপাতি। এসব যন্ত্রপাতি কস্মিনকালেও দ্যাখেনি গজ। সে হাঁ করে দেখতে লাগল।

হঠাৎ পায়ে কুট করে কী একটা কামড়াল গজকে।

একটু চমকে উঠে গজ চেয়ে দেখল, সবুজ রঙের একটা কাঁকড়াবিছে।

কাঁকড়াবিছের হুল সাংঘাতিক, চব্বিশ ঘণ্টা ধরে যন্ত্রণায় ছটফট্ করতে হয়। তেমন-তেমন কাঁকড়াবিছের হুলে মানুষ মরেও যায়। তাই গজ ভীষণ আতঙ্কিত চোখে বিছেটার দিকে চেয়ে রইল।

হুল দিয়েই বিছেটা গুড়গুড় করে হেঁটে গিয়ে একটা ইঁদুরধরা বাক্সের মতো ছোট বাক্সের দরজা দিয়ে ঢুকে গেল। দরজাটা ধীরে বন্ধ হয়ে গেল।

গজ বসে পড়ে তার বাঁ পায়ের গোড়ালির কাছটা দেখল। কোনও ক্ষত নেই, ব্যথা বা জ্বালাও সে টের পাচ্ছে না। কিন্তু ভারী সুন্দর একটা গন্ধ মাদকের মতো তার নাকে এসে লাগল আর শরীরটা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল, ঘুমে জড়িয়ে আসতে লাগল চোখ।

অন্য কেউ হলে ঢলে পড়ত, কিন্তু গজ'র শরীরে এবং মনে অসম্ভব শক্তি। সে প্রাণপণে মাথা ঠিক রেখে উঠে দাঁড়াল। তারপর দুটো ভারী পা ফেলে ফেলে বাইরের দিকে দৌড়তে লাগল। তার ভয় হচ্ছিল, অজ্ঞান হয়ে এখানে পড়ে থাকলে সে আবার দানোদের হাতে ধরা পড়ে যাবে।

এরকম আশ্চর্য মাতাল-করা সুগন্ধ আর এমন মনোরম ঘুমের অনুভূতি কখনও হয়নি গজ'র। সে চোখে নানা রঙের রামধনু দেখছিল। তার খুব হাসতে ইচ্ছে করছিল, গান গাইতে ইচ্ছে করছিল, নাচতে ইচ্ছে করছিল।

কাঁকড়াবিছের বিষে এমনটা হওয়ার কথা নয়। রহস্য হল, এই বিছেটা সবুজ। পৃথিবীতে গজ যতদূর জানে, সবুজ রঙের কাঁকড়াবিছে হয় না। এই অদ্ভুত বিছেটার বিষও যে অভিনব হবে তাতে আর বিচিত্র কী?

গজ প্রাণপণে দৌড়তে লাগল। কিন্তু সে যাকে দৌড় বলে মনে করছিল তা

আসলে হাঁটি-হাঁটি পা-পা। কিন্তু তবু গজ তার ঘুমে ভারাক্রান্ত শরীরটাকে একটা ভারী বস্তার মতো টেনে-টেনে এগোতে লাগল। থামল না।

কিন্তু সুড়ঙ্গের মুখটা অনেক দূর এবং চড়াই ভাঙতে হচ্ছে বলে গজ বেশিদূর এগোতে পারল না। শরীর ক্রমে ভেঙে পড়ে পাচ্ছে। আর বেশিক্ষণ গজ এই ঘুম-রাক্ষসের সঙ্গে লড়াই চালাতে পারবে না।

ভাগ্যবলেই গজ বাঁ দিকে একটা গর্ত দেখতে পেল। খুব আবছা দেখা যাচ্ছিল।

গজ প্রাণপণে গর্তটার দিকে এগোতে লাগল। খুবই সংকীর্ণ গর্তটা। একটু উঁচুতেও বটে। কিন্তু প্রাণ বাঁচাতে গজ অতি কষ্টে গর্তটার কানা ধরে উঠে পড়ল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে একটু এগোতেই একটা ভীষণ ঢালু বেয়ে সে গড়িয়ে পড়ে গেল।

পতনটা আটকানোর কোনও উপায় বা শক্তি গজ'র ছিল না। ভারী শরীরটা গড়াতে-গড়াতে কতদূরে যে নেমে গেল গজ তার হিসেব করতে পারল না। তারপর হঠাৎ শূন্যে নিক্ষিপ্ত হল সে।

ঝপাং, একটা শব্দ হল। গজ'র আর কিছু মনে রইল না। তবে এক গাঢ় ঘুমে সম্পূর্ণ তলিয়ে যাওয়ার আগে টের পেল, সে জলের মধ্যে পড়েছে, কিন্তু ডোবেনি।

পঞ্চানন্দ যখন চোখ মেলল, তখনও রাতের অন্ধকার আছে।

চোখ মেলে পঞ্চানন্দ প্রথমটায় কিছুক্ষণ বুঝতেই পারল না, সে কোথায় এবং কেন এভাবে পড়ে আছে। ঝোপঝাড়ের মধ্যে পড়ায় তার হাত-পা ছড়ে গিয়ে বেশ জ্বালা করছে। মাথাটা ভীষণ ফাঁকা।

পঞ্চানন্দ উঠে বসে মাথাটা আচ্ছাসে ঝাঁকাল। নিজের গায়ে নিজে চিমটি দিল। বেশ করে আড়মোড়া ভেঙে একখানা মস্ত হাই তুলল। তারপরই জিনিসটা টের পেল সে। খিদে। হ্যাঁ, পেটটা তার মাথার চেয়েও বেশি ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে।

খিদে টের পাওয়ার পরই ঝপ্ করে সব ঘটনা মনে পড়ে গেল তার। জলায় একটা গগনচাকি নেমেছে। সে তাই এখানে হাজির হয়েছিল। ঝোপের আড়ালে বসে নজর রাখতে…

ঘুমিয়ে পড়েছিল?

না, পঞ্চানন্দ তত অসাবধানী লোক নয়। অমন একটা ঘটনা সামনে ঘটতে চলেছে, আর সে ঘুমিয়ে পড়বে—এ হতেই পারে না।

তা হলে!

পঞ্চানন্দ উঠে পড়ল। তারপর আঁতিপাঁতি করে চারদিকটা ঘুরে দেখতে লাগল টর্চ দিয়ে। টর্চটা তার হাতের মুঠোতেই থেকে গিয়েছিল।

খুব বেশি খুঁজতে হল না। মাত্র হাত-দশেক দূরে একটা বুনো কুলগাছের

আড়ালে একটা লম্বা টর্চের মতো বস্তু পড়ে আছে।

যন্ত্রটা হাতে তুলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল পঞ্চানন্দ। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারল না। কোনও যন্ত্রই হবে, তবে কী কাজে লাগে, তা কে জানে। গায়ে অনেকগুলো বোতাম আছে। পঞ্চানন্দ সাবধানী লোক, সে কোনও বোতামে চাপটাপ দিল না, কী থেকে কী হয়ে যায়, কে বলবে। তবে যন্ত্রটা সে কাছে রাখল।

জলার দিকটা আগের মতোই আঁধারে ঢেকে আছে।

পঞ্চানন্দ চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে ধীরে-ধীরে জলার দিকে এগোতে লাগল।

যেখানে চাকিটা নেমেছিল বলে তার ধারণা সেখানে তুঁতেবন। জংলা জায়গা। অনেকটা জলও পেরোতে হবে। তবে জলার জলও কখনই হাঁটুর ওপরে ওঠে না।

পঞ্চানন্দ কাপড়টা একটু তুলে পরে নিল। তারপর ঠাণ্ডা জলে কাদায় নেমে পড়ল দুর্গা বলে। মাঝে-মাঝে একটু থেমে দিকটা ঠিক করে নিতে হচ্ছিল। টর্চটা সে ভয়ে জ্বালল না।

জল ভেঙে ঢিবিটার ধার দিয়ে ভাঙা জমির দিকে উঠবার সময় হঠাৎ একটা মস্ত পাথর বা অন্য কিছুতে পা বেধে দড়াম করে পড়ল পঞ্চানন্দ। এই শীতে জামা-কাপড় জলে কাদায় একাকার।

তবে পঞ্চানন্দর এসব অভ্যাস আছে। শীতে হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে সে টর্চটা হাতড়ে বের করল। বেশ ভাল টর্চ, ভিজেও নেবেনি।

কিন্তু টর্চ জ্বেলে যা দেখল পঞ্চানন্দ তাতে হাঁ হয়ে গেল। একটা বিশাল চেহারার লোক পড়ে আছে জলায়।

পঞ্চানন্দ টর্চটা নিবিয়ে নিচু হয়ে পরীক্ষা করে দেখল। না, মরেনি, নাড়ি চলছে, শ্বাস বইছে।

পঞ্চানন্দ চারদিকটা আবার ভাল করে দেখে নিয়ে হাতের আড়াল করে টর্চটা লোকটার মুখে ফেলল।

মুখটা খুব চেনা-চেনা ঠেকছে। অথচ কিছুক্ষণ চিনতেপারল না পঞ্চানন্দ।

দ্বিতীয়বার টর্চ জ্বালাতেই সন্দেহ কেটে গেল।

লোকটা গজ-পালোয়ান।

নামে আর কাজে পালোয়ান হলেও গজ'র কখনও এমন হাতির মতো চেহারা ছিল না। বরাবরই সে পাতলা ছিপ্‌ছিপে। ছিপ্‌ছিপে শরীরটা ছিল ইস্পাতের মতো শক্ত আর পোক্ত।

কিন্তু এই গজ-পালোয়ান গামার চেয়েও বিশাল। দুটো হাত মুগুরের মতো, ছাতি বোধহয় আশি ইঞ্চির কাছাকাছি। ঘাড়ে-গর্দানে এক দানবের আকৃতি।

পঞ্চানন্দ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল। গজ'র এরকম পরিবর্তন হল

কী করে। মাত্র দু'দিন আগেই গজকে শিবুবাবুর ল্যাবরেটরিতে দেখেছে সে। মাত্র দু'দিনে কারও এরকম বিশাল চেহারা হয়!

পঁচিশ

আকাশ থেকে একটা অদ্ভুত বস্তু নেমে আসার দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছিল ঘড়ি। আসলে সে এ-বাড়িতে পঞ্চানন্দ নামে উটকো যে-লোকটা এসে জুটেছে তার ওপর নজর রাখবার জন্যই রাতে জেগে অপেক্ষা করছিল। ঘড়ির দৃঢ় বিশ্বাস তার ভালমানুষ এবং কবি-বাবাকে জপিয়ে হাত করে এ-লোকটা একটা বড় রকমের দাঁও মারার মতলবে আছে। লোকটা যে বিশেষ সুবিধের নয়, তা এক-নজরেই বোঝা যায়। কিন্তু ঘড়ির বাবা হরিবাবু বড়ই সরল সোজা এবং আপনভোলা মানুষ। কে খারাপ আর কে ভাল তা বিচার করার মতো চোখই তাঁর নেই। তাই সে-ভার ঘড়ি নিজে থেকেই নিল। চোর-জোচ্চোররা রাতের বেলাতেই সজাগ হয় এবং তাদের কাজকর্ম শুরু করে। ঘড়িও তাই গভীর রাতেই লোকটাকে হাতেনাতে ধরে ফেলার মতলব ছিল।

যা ভেবেছিল হয়েও যাচ্ছিল তাই। নিশুত রাতে পঞ্চানন্দ বেরোল হরি-বাবুর ঘর থেকে। নিঃশব্দ, চোরের মতোই হাবভাব। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ঘড়ি খুব তীক্ষ্ন চোখে লক্ষ্য করছিল। কিন্তু লোকটাকে যে গিয়ে জাপটে ধরবে তার উপায় নেই। কারণ হরিবাবু রাত জেগে কবিতার পর কবিতা লিখে চলেছেন। শোরগোল হলেই উঠে এসে বকাবকি করবেন। ঘড়ি তাই লোকটাকে শুধু নজরে রাখছিল।

তবে লোকটা বিশেষ গণ্ডগোল পাকাল না। শুধু চারদিকটায় ঘুরে-ঘুরে কী একটু দেখে নিয়ে বেড়ালের মতো সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেল। ছাদে গিয়েই লোকটাকে ধরার সুবিধে হবে ভেবে যেই না ঘড়ি সিঁড়ির কাছে গেছে, অমনি হরিবাবু তাঁর ঘর থেকে 'উঃ আঃ' শব্দ করতে করতে বেরিয়ে এসে ছাদপানে চললেন। ঘড়িকে কাজেই ক্ষ্যামা দিতে হল।

নিজের ঘরে এসে জানালা খুলে যখন ঘড়ি ছাদের পরিস্থিতিটা উৎকর্ণ হয়ে আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল, তখনই সে আকাশের অদ্ভুত বস্তুটা দেখতে পায়। অনেকটা পটলের আকৃতি, নীলাভ উজ্জ্বল একটা জিনিস ধীরে-ধীরে নেমে আসছে।

তখন ঘড়ি তার ঘুমকাতুরে ভাই আংটিকে ডেকে তুলল, "এই ওঠ, দ্যাখ্ কী কাণ্ড হচ্ছে।"

আংটি উঠে জিনিসটা দেখল এবং রুদ্ধশ্বাসে বলল, "উফো,আনআয়ডেণ্টি-ফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট।"

অপলক চোখে দুই ভাই জিনিসটা লক্ষ্য করতে লাগল। কিন্তু হঠাৎই আলো নিবে গিয়ে বস্তুটা অন্ধকার হয়ে গেল। আর দেখা গেল না।

ডাকাবুকো বলে দুই ভাইয়েরই খ্যাতি আছে। তারা সহজে ভয় খায় না।

দুনিয়ায় তাদের যত ভয় বাবাকে। অথচ হরিবাবুর মতো নিরীহ আনমনা ভালমানুষ লোক হয় না। ছেলেদের গায়ে তিনি কখনও হাত তোলেননি। বকাঝকাও করেন না বড় একটা। তবু দুই ডানপিটে ভাই ওই একজনকে যমের মতো ডরায়। আর কাউকে বা কিছুতেই তারা ভয় পায় না। উড়ন্ত-চাকিকেই বা পাবে কেন?

দুই ভাই চটপট্ শীতের পোশাক পরে নিল। মাথায় বাঁদুরে টুপি আর হাতে দস্তানা পরতেও ভুলল না। অস্ত্র বলতে ঘড়ির একটা স্কাউট ছুরি আর আংটির চমৎকার একটা গুলতি। আর সম্বল গায়ের জোর এবং মগজের বুদ্ধি।

এ শহরের সবরকম শর্টকাট তাদের জানা। কাজেই গজ-পালোয়ানের আস্তানায় পৌঁছুতে দেরি হল না।

চক-সাহেবের বাড়ির পর বিশাল জলা। তার ওপাশে তুঁতেবন। আর আছে বিখ্যাত সেই রাজবাড়ির ঢিবি। জায়গাটা বেশ গোলমেলে। অজস্র ঝোপঝাড় আর জলকাদায় দুর্গম। তবে ঘড়ি আর আংটি এ জায়গা নিজেদের হাতের তেলোর মতোই চেনে।

ঘড়ি চারদিকে চেয়ে বলল, "আমার যতদূর মনে হয় উফোটা জলার ওপাশে তুঁতেবনের দিকে কোথাও নেমেছে।"

আংটি গম্ভীর মুখে বলল, "হু, কিন্তু জলা পার হবি কী করে?"

আসলে আংটি একটু শীতকাতুরে।

ঘড়ি গম্ভীর মুখে বলল, "জলা পার হতে হলে জলে নামতে হবে।"

"ও বাবা, আমি বরং এদিকটায় পাহারা দিই, তুই এগিয়ে দেখে আয়।"

ঘড়ি কিন্তু এই প্রস্তাবে আপত্তি করল না। পকেট থেকে ছোট্ট একটা টর্চ বের করে চারদিকটা দেখে নিয়ে বলল, "চক-সাহেবের বাড়িতে একটু আগে একটা আলো দেখেছি। যতদূর জানি, গজ-পালোয়ান এখন ও-বাড়িতে নেই। কিন্তু আলো যখন দেখা গেছে, তখন কেউ না কেউ আছে ঠিকই। তুই চারদিকে নজর রাখিস। বিশেষ করে চক-সাহেবের বাড়ির দিকটায়। আমি জলার ওদিকটা দেখে আসছি।"

আংটি ঘাড় নাড়ল প্রকাণ্ড একটা হাই তুলতে তুলতে। তারপর বলল, "আমি বরং চক-সাহেবের বাড়িতেই গিয়ে ঢুকে পড়ি। গজদার বিছানাটা পড়ে আছে, একটু গড়িয়ে নিইগে। তুই ফিরে এসে আমাকে ডেকে নিস।"

ঘড়ি তার প্যান্টের পা গুটিয়ে জুতোসুদ্ধু জলে নেমে পড়ল।

অন্ধকারে জলের মধ্যে ঘড়ি মিলিয়ে যাওয়ার পর আংটি আর-একটা বিকট হাই তুলল। ঘুমে চোখ ঢুলে আসছে। কৌতূহল তার যতই হোক শীত আর রাতজাগা সে একদম সইতে পারে না।

চক-সাহেবের বাড়ি বেশি দূর নয়। আংটি চারদিকটা লক্ষ্য করতে করতে

গিয়ে বাড়িটায় ঢুকে পড়ল। ঘড়ি বলল আলো জ্বলতে দেখেছে, কিন্তু আংটি কোথাও কোনও আলোর চিহ্ন পেল না। তবু সাবধানের মার নেই। সে চারদিকটা ঘুরে ঘুরে দেখে নিল। না, কোথাও কেউ নেই। গজু-পালোয়ানের ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকে দেখল, চৌকির ওপর বিছানা পাতাই রয়েছে। সামান্য কিছু জিনিসপত্র যেমন-কে তেমন পড়ে আছে।

আংটি আর একটা হাই তুলে বিছানার চারদটা তুলে ভাল করে মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। গায়ে গরমজামা থাকায় তেমন শীত করল না। ঘুমও এসে গেল টপ করে।

গাঢ় ঘুমের সময় মানুষের শ্বাস যেমন ঘন-ঘন পড়ে, সেরকমই শ্বাস পড়তে লাগল আংটির। মৃদু-মৃদু নাকও ডাকছিল তার।

মিনিট পনেরো কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ খুব ধীরে-ধীরে ঘরের দরজাটা খুলে গেল। নিঃশব্দে একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল দরজায়।

জলা পার হতে ঘড়ির বিশেষ সময় লাগল না। জল থেকে ডাঙায় উঠে সে টর্চ জেলে পায়ে জোঁক লেগেছে কি না দেখে নিল। তারপর রাজবাড়ির ঢিবির নীচে উঁচু জমিতে উঠে জুতো খুলে মোজাটা নিংড়ে নিয়ে ফের পরল।

তুঁতেবন এখনও বেশ খানিকটা দূরে। ঘড়ি উঠল। উঠতে গিয়েই হঠাৎ তার নজরে পড়ল ঢিবিটার গায়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে বেশ বড় একটা গর্ত। এরকম গর্ত থাকার কথা নয়। আর আশ্চর্যের কথা, গর্তের ভিতর থেকে একটা আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

ঘড়ি ভারী অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ তার মনে হল, মহাকাশযানটা ওই ঢিবির মধ্যে গিয়ে সেঁধোয়নি তো!

ঘড়ি ধীরে-ধীরে ঢিবির ঢাল বেয়ে গর্তটার মুখ-বরাবর চলে এল। ভয় যে করছিল না তা নয়। কিন্তু কৌতূহলটাই অনেক বেশি জোরালো।

ঢিবির মুখে এসে সাবধানে উঁকি দিয়ে ভিতরে যা দেখল, তাতে বেশ অবাক হয়ে গেল সে। দিব্যি আলোকিত সুড়ঙ্গ। ভিতরটা বেশ পরিষ্কার।

যেন চুম্বকের টানে সম্মোহিতের মতো ঘড়ি ভিতরে ঢুকল। চারদিকে চেয়ে সে বুঝল, ঢিবিটা সম্পর্কে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তা মোটেই মিথ্যে নয়। বাস্তবিকই এখানে কোনওদিন একটা প্রাসাদ ছিল।

কিন্তু তার চেয়েও যেটা বিস্ময়কর, তা হল, সুড়ঙ্গটাকে কে বা কারা খুব যত্ন নিয়ে পরিষ্কার করেছে। ভিতরে খুঁড়ে খুঁড়ে ছোট বড় নানা রকম কুঠুরি বানিয়েছে। সব কুঠুরিরই দরজা বন্ধ। সুড়ঙ্গের ছাদে লাগানো আলোগুলো দেখে ঘড়ি হাঁ হয়ে গেল। ইলেকট্রিক লাইট নয়, স্রেফ এক-একটা উজ্জ্বল পাথর।

খানিক দূর হেঁটে গিয়ে সে দেখতে পেল, সুড়ঙ্গটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে।

ঘড়ি এগোতে লাগল। প্রতি মুহূর্তেই ভয় হচ্ছে, কেউ এসে পথ আটকাবে বা আক্রমণ করবে। কিন্তু সেরকম কিছু হল না।

ঘড়ি এসে থামল প্রকাণ্ড দরবার-ঘরে। চারদিকে অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি। কিন্তু কোনও মানুষজন নেই।

ঘড়ি যখন চারদিকে চেয়ে দেখছিল তখন হঠাৎ পায়ের কাছে একটা ইঁদুর-কলের মতো ছোট্ট বাক্স নজরে পড়ল তার। এমনিতে পড়ত না, কিন্তু বাক্সের ডালাটা আপনা থেকেই খুলে যাচ্ছিল বলে তার চোখ আটকে গেল।

বাক্সের ভিতর থেকে একটা সবুজ কাঁকড়াবিছে বেরিয়ে এল।

ঘড়ি কাঁকড়াবিছে ভালই চেনে। অনেকবার ধরে সুতোয় বেঁধে খেলা করেছে। এক-আধবার হুলও খেয়েছে। কাজেই সে বিশেষ ভয় পেল না। ফট্ করে এক পা পিছিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখল।

কাঁকড়াবিছে সবুজ রঙের হয় কি না তার জানা নেই; তবে সে কখনও দ্যাখেনি।

বিছেটা তাকে লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছে, এটা বুঝতে বিশেষ বেগ পেতে হল না ঘড়ির। বাক্সের ডালা আপনা থেকেই খুলে যাওয়া এবং আশ্চর্য সবুজ রঙের বিছের আবির্ভাবের পিছনে যে রহস্য আছে, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় এখন ঘড়ির নেই। আপাতত প্রয়োজন আত্মরক্ষা।

ঘড়ি বিছেটার সামনে জুতোসুদ্ধু পা এগিয়ে দিয়ে নিচু হয়ে হুলের শুঁড়টা দু' আঙুলে চেপে ধরে বিছেটাকে তুলে নিল। এই অবস্থায় বিছে খুবই অসহায়।

হুলটা সাবধানে ধরে রেখে বিছেটাকে কাছ থেকে যখন দেখল ঘড়ি, তখন সে স্পষ্টই বুঝতে পারল, এটা আসল কাঁকড়াবিছে মোটেই নয়। বিছেটার শরীর ধাতু দিয়ে তৈরি। ভিতরে স্প্রিং আছে, তার জোরে বিছের পা নড়ে। মুখের কাছে একটা লম্বা দাঁড়া রয়েছে যা অনেকটা সূক্ষ্ম টেলিস্কোপিক অ্যান্টেনার মতো।

হুলটা ভাল করে লক্ষ্য করল ঘড়ি। যা দেখল, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। হুলের বদলে যেটা বারবার বেরিয়ে আসছে, তা স্টেনলেস স্টিলের তৈরি একটা ফাঁপা ছুঁচ। অনেকটা ইন্জেকশন দেওয়ার ছুঁচের মতোই।

ঘড়ি তার রুমালটা বের করে ছুঁচের মুখে ধরতেই সেটা বিঁধে গেল রুমালে আর কয়েক ফোঁটা ভারী সুগন্ধি তরল বস্তু বেরিয়ে এল ছুঁচ থেকে।

ছাব্বিশ

অন্ধকারে যখন আংটি চোখ মেলল, তখন তার মাথাটা ঘুমে ভরা। কোথায় শুয়ে আছে সেই বোধটা পর্যন্ত নেই। কিছুক্ষণ ভোম্বলের মতো চেয়ে থাকার পর হঠাৎ সে তড়াক করে উঠে বসল। বিছানার পাশে একটা ভূত দাঁড়িয়ে

আছে।

ভূত যে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। মুখটা ভাল দেখা না গেলেও এরকম শীর্ণকায় এবং লম্বা চেহারার লোক বড় একটা নেই। এই সেই নকল রাজার সেক্রেটারি, যাকে সে এবং তার দাদা ঘাড় বাসের মধ্যে খুন হতে দেখেছিল।

মারপিট আংটি বিস্তর করেছে, কিন্তু ভূতের সঙ্গে কীভাবে লড়তে হয় তা তার অজানা। তার ওপর তার ভূতের ভয়ও আছে।

সুতরাং আংটি একটা বিকট খ্যা-খ্যা শব্দে গলাখাঁকারি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "কে, কে আপনি?"

লম্বা সিড়িঙ্গে ছায়ামূর্তিটা আংটির দিকে একদিষ্টে চেয়ে ছিল। পাথরের মতো স্থির। আংটি প্রশ্নের জবাবে একটু ফ্যাসফেসে গলায় বলল, "তুমি এখানে কী করছ?"

আংটি তোতলাতে লাগল, 'আ…আমি…আমি…কিন্তু আ-আপনি তো মরে গিয়েছিলেন!"

লম্বা লোকটা নিজের কোমরে হাত দিয়ে কোনও একটা বোতাম টিপল। আংটি দেখল লোকটার পায়ের দিকে, বোধহয় জুতোয় লাগানো একটা আলো জ্বলে উঠল এবং লোকটাকে বেশ স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। তবে তলার দিক থেকে আলো ফেললে যে-কোনও মানুষকে একটু ভৌতিক-ভৌতিক দেখায়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা গায়ে আলো ফিট করা লোক জীবনে দ্যাখেনি আংটি।

সে ফের আমতা-আমতা করে বলল, "আ-আপনি কিন্তু আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন।"

লোকটা মৃদু ফ্যাসফেসে গলায় বলল, "এখন দ্যাখো তো, আমি মরে গেছি বলে কি মনে হচ্ছে?"

আংটি দেখল, বাস্তবিকই লোকটার শরীরে কোনও ক্ষতচিহ্ন নেই। একটু ভুতুড়ে দেখালেও লোকটাকে তার জ্যান্ত বলেই মনে হচ্ছিল। মাথাটা গুলিয়ে গেল আংটির। সে বোকার মতো জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি জ্যান্ত মানুষ?"

লোকটা আলো নিবিয়ে দিয়ে বলল, "জ্যান্ত কি না জানি না, তবে ভূত-টুত নই।"

"তা-তার মা-মানে?"

"মানে বললেও তুমি বুঝতে পারবে না। সে কথা থাক। এখন বলো তো, তোমরা দুই ভাই আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে এলে কেন?"

"আমরা ভেবেছিলাম, আপনারা আমাদের কিডন্যাপ্ করছেন।"

"কিডন্যাপ্ কি ওভাবে করে? তোমাদের খেলা দেখে মহারাজ খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি তোমাদের উপকারর করতে চেয়েছিলেন। পালিয়ে এসে

তোমরা ওঁকে অপমান করেছ।"

দাদা ঘড়ি সঙ্গে থাকলে আংটি তেমন ভয় খায় না। কিন্তু একা বলেই তার বেশ ভয়-ভয় করছিল। সে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল "উনি যে আমাদের উপকার করতে চেয়েছিলেন তা আমরা বুঝতে পারিনি।"

"তা না হয় পারোনি, কিন্তু তোমরা ওঁকে মারারও চেষ্টা করেছ। আজ অবধি ওঁর গায়ে হাত তুলে কেউ রেহাই পায়নি।"

আংটি তাড়াতাড়ি বলল, "আমি সেজন্য মাপ চাইছি।"

"মাপ স্বয়ং মহারাজের কাছেই চাওয়া উচিত। উনি তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমার সঙ্গে এসো।"

আংটি অবাক হয়ে বলল, "উনি কি এখানে আছেন ?"

"আছেন বই কী।"

আংটি চারদিকে একবার চেয়ে দেখে নিল। দাদা ঘড়ি সঙ্গে নেই, সে একা। এই অবস্থায় আবার এদের খপ্পরে পড়লে রেহাই পাওয়া অসম্ভব হবে। সুতরাং পালাতে হলে এই বেলাই পালানো দরকার। সিড়িঙ্গে লোকটা বোধহয় দৌড়ে তার সঙ্গে পেরে উঠবে না। পারলে জঙ্গলের মধ্যেই তাদের তাড়া করত।

আংটি যখন এসব ভাবতে-ভাবতে গড়িমসি করছে, তখন লোকটা বলল, "পালানোর কথা ভাবছ ?"

আংটি আমতা-আমতা করে বলল, "তা নয় ঠিক।"

"পালালে আমরা কিছুই করব না। যখন আগেরবার পালিয়েছিলে তখন আমরা অনায়াসেই তোমাদের ধরে ফেলতে পারতাম। কিন্তু মহারাজের সেরকম ইচ্ছে নয়। তাই তোমাদের পালাতে দেখেও আমরা কিছুই করিনি এবারও করব না।

আংটি ভয়ে ভয়ে বলল, "কিন্তু সেবার আপনি আমাদের পিছু নিয়েছিলেন। বাসের মধ্যে আপনাকে কে যেন গুলি করেছিল।"

লোকটা নিরুত্তাপ গলায় বলল, "আমি মোটেই তোমাদের পিছু নিইনি। অন্য একটা জরুরি কাজে মহারাজ আমাকে পাঠিয়েছিলেন। পথে কে বা কারা আমাকে খুন করার চেষ্টা করে।"

"হ্যাঁ, আপনার বুকে গুলি লেগেছিল।"

"গুলি নয়। তার চেয়ে অনেক মারাত্মক কিছু। কিন্তু আসল কথা, আমি তোমাদের পিছু নিইনি। আজও নেব না। তোমার বা তোমাদের কারও কোনও ক্ষতি করা মহারাজের উদ্দেশ্য নয়।"

আংটি এই বিপদেয় মধ্যে যেন একটু ভরসা পেল। লোকটার কথার মধ্যে একটু সত্যও থাকতে পারে।

সে জিজ্ঞেস করল, "উনি কোথাকার মহারাজ ?"

"উনি মহারাজ নামে। ইচ্ছে করলে উনি গোটা দুনিয়াটারই সম্রাট হতে

পারেন। কিন্তু তেমন ইচ্ছে তাঁর নেই।"

"আপনার বুকে গুলি লাগা সত্ত্বেও আপনি বেচে আছেন কী করে?"

"সে সব মহারাজ জানেন। এ পর্যন্ত আমাকে অনেকবারই খুন করবার চেষ্টা হয়েছে। কোনওবারই মরিনি। একটু আগেই কতগুলো বর্বর আমাকে আক্রমণ করেছিল। এতক্ষণ আমার বেঁচে থাকার কথা নয়। তবু দ্যাখো, দিব্যি বেঁচে আছি।"

কথাগুলো আংটি ভাল বুঝতে পারছিল না। খুব হেঁয়ালির মতো লাগছিল। একটু দুরদুরুও করছিল বুক। কিন্তু সে প্রাণপণে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল। বলল, "মহারাজের কাছে যদি যেতে না চাই, তা হলে সত্যিই উনি কিছু করবেন না?"

"না। তবে গেলে তোমারই লাভ হবে। অকারণে ভয় পেও না। তোমার ক্ষতি করতে চাইলে অনায়াসেই করতে পারি। আমার কাছে এমন ওষুধ আছে চোখের পলকে তেমোকে অজ্ঞান করে দেওয়া যায়। এমন অস্ত্র আছে যা দিয়ে তোমাকে ধুলো করে দেওয়া কিছুই নয়। তবে সেসব আমরা প্রয়োগ করার কথা চিন্তাও করি না।"

আংটি কাঁপা গলায় বলল, "ঠিক আছে। মহারাজ কোথায়?"

"আমার সঙ্গে এসো।"

আংটি লোকটার পিছু-পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

লোকটা কোমরের বোতাম টিপে জুতোর আলোটা জ্বালিয়ে নিয়েছে। বেশ ফটফটে আলো। এরকম সুন্দর আলোওলা জুতো আংটি কখনও দ্যাখেনি। জুতোর ডগায় দুটি ছোট হেডলাইটের মতো জিনিস বসানো। আলোটা নীলচে এবং তীব্র।

সিড়িঙ্গে লোকটা একটা ধ্বংসস্তূপের ওপরে উঠল। স্তূপের ওপরে একটা ড্রাম এমনি পড়ে আছে।

লোকটা ড্রামটাকে দু'হাতে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তুলে ফেলল। তলায় একটা গর্ত।

লোকটা বলল, "নিশ্চিন্তে নামো। কোনও ভয় নেই।"

আংটি একটু ইতস্তত করল। ভয় করছে বটে, কিন্তু ভয় পেলে লাভ নেই। তাই সে 'দুর্গা' বলে গর্তের মধ্যে পা বাড়াল।

না, পড়ে গেল না আংটি। গর্তের মধ্যে থাক্-থাক্ সিঁড়ি। কয়েক ধাপ নামতেই সিড়িঙ্গে লোকটাও গর্তের মুখ বন্ধ করে তার পিছু-পিছু নেমে এল।

আংটি দেখল, জলাটা অনেকটা সাবওয়ের মতো। একটু নোংরা আর সরু, এই যা, তবে দেখে মনে হয়, এই সাবওয়ে বহুকালের পুরনো। বোধহয় এই বাড়ি যখন তৈরি হয়েছিল তখনই চক-সাহেব এই সুড়ঙ্গ বানিয়েছিলেন। আংটি, ঘড়ি এবং তাদের বন্ধুরা বহুবার এ-বাড়িতে এসে চোর-চোর খেলেছে,

গুপ্তধনের সন্ধান করেছে। কিন্তু এই সুড়ঙ্গটা কখনও আবিষ্কার করতে পারে নি।

একটু এগোতেই ফের সিঁড়ি। এবার ওপরে ওঠার।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে আংটি যেখানে হাজির হল, সেটা এক বিশাল হলঘর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এরকম ঘর যে এ-বাড়িতে থাকতে পারে তা যেন বিশ্বাস হতে চায় না। ঘরে বিজলি বাতির মতো আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু খুব মৃদু। ঘরের একধারে কয়েকটা যন্ত্রপাতি রয়েছে। একটা যন্ত্র থেকে অবিরল নানারকম চিঁ-চিঁ, কুঁই-কুঁই, টর-র টর-র শব্দ হচ্ছে।

হলঘরের অন্যপ্রান্তে একটা টেবিলের সামনে বসে একজন লোক অখণ্ড মনোযোগে একটা গ্লোব দেখছে। গ্লোবটা নীল কাচের মতো জিনিসে তৈরি। তাতে নানারকম আলো।

লোকটাকে চিনতে মোটেই কষ্ট হল না। মহারাজ।

মহারাজ আংটির দিকে তাকালেন।

আংটি ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মহারাজ তাকে দেখে হাসলেন। হাসিটা ভারী সুন্দর। রাগ থাকলে এরকম করে কেউ হাসতে পারে না।

মহারাজ ভরাট গলায় বললেন. "এসো আংটি, তোমার জন্যই বসে আছি।"

আংটি এক পা দু' পা করে এগিয়ে গেল।

মহারাজের ইঙ্গিতে সিড়িঙ্গে লোকটা একটা টুল এগিয়ে দিল।

আংটি মুখোমুখি বসতেই মহারাজ বললেন, "তুমি খুব ভয় পেয়েছ বলে মনে হচ্ছে।"

আংটি বলল, "না, এই একটু..."

মহারাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তবে দুঃখ এই যে, পৃথিবীকে কতগুলো বর্বরের হাত থেকে বাঁচানো বোধহয় সম্ভব হবে না। অনেক চেষ্টা করছি। কিন্তু..."

বলেই মহারাজ তাঁর গোলকের ওপর ঝুঁকে কী একটা দেখতে লাগলেন।

আংটি কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে চেয়ে রইল।

মহারাজ ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে তাঁর অ্যাসিস্ট্যাণ্টকে বললেন, "খুব তাড়াতাড়ি আমার আর্থ মনিটরটা নিয়ে এসো তো।"

সিড়িঙ্গে লোকটা দৌড়ে গিয়ে একটা ক্যালকুলেটরের মতো যন্ত্র নিয়ে এল।

সাতাশ

আর্থ-মনিটর কাকে বলে, তা আংটি জানে না। কিন্তু সে এটা বেশ বুঝতে পারছিল যে, সাধারণ ক্যালকুলেটরের মতো দেখতে হলেও যন্ত্রটা সামান্য নয়। মহারাজ যন্ত্রটা হাতে নিয়েই কী একটু কলকাঠি নাড়লেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে যন্ত্রটার চার কোণ দিয়ে চারটে লিকলিকে অ্যাণ্টেনা বেরিয়ে এল। আরও

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, চারটে অ্যান্টেনাই নড়ন্ত। নিজে থেকেই অ্যান্টেনাগুলো কখনও ওপরে কখনও নীচে ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছে, আবার সটান সোজা হয়ে যাচ্ছে, ছোট হয়ে যাচ্ছে, আবার গলা বাড়িয়ে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। চারটে ধাতব যষ্টির ওরকম যথেচ্ছ নড়াচড়া দেখে আংটির গা শিরশির করতে থাকে।

মহারাজ যন্ত্রটির দিকে চেয়ে কী দেখছিলেন তিনিই জানেন। শরীরটা পাথরের মতো স্থির, চোখের পলক পড়ছে না। মহারাজকে খুব তীক্ষ্ণ চোখেই লক্ষ্য করছিল আংটি। পরে তার মনে হল, এরকম মানুষ সে কখনও দ্যাখেনি। লোকটা লম্বা-চওড়া সন্দেহ নেই, গায়েও বোধহয় অসীম ক্ষমতা। তার চেয়েও বড় কথা, লোকটা যে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছে তা একমাত্র খুব উঁচুদরের বিজ্ঞানীরাই বোধহয় করে থাকে। টেবিলের ওপর রাখা গোলকটাও লক্ষ্য করল আংটি। গ্লোবের মতো দেখতে হলেও মোটেই গ্লোব নয়। ঠিক যেন আকাশের জ্যান্ত মডেল। তাতে গ্রহ তারা নক্ষত্রপুঞ্জের চলমান ছবি দেখা যাচ্ছে।

মহারাজ ক্যালকুলেটর থেকে মুখ তুলে বললেন, "আংটি, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, জবাব দেবে?"

আংটি ভয়ে সিঁটিয়েই ছিল। সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"যদি তোমাদের এই পৃথিবীকে সৌরজগতের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, তা হলে কী ঘটতে পারে জানো?"

আংটি অবাক হয়ে বলল, "তা হলে পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে।"

মহারাজ মাথাটা ওপরে-নীচে মৃদুভাবে নাড়িয়ে বললেন, "ঠিক তাই। সৌরজগতের বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়ামাত্রই পৃথিবীর উপরিভাগে যা কিছু আছে, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। একটা জীবাণু অবধি বেঁচে থাকবে না, তা বলে পৃথিবী নামক ম্যাসটি নষ্ট হবে না। এটাকে যদি অন্য কোনও নক্ষত্রের কক্ষপথে স্থাপন করা হয়, তা হলে আবার এই গ্রহটিকে কাজে লাগানো সম্ভব হবে। আবহমণ্ডল তৈরি করে নতুন বসত গড়ে তোলা কঠিন হবে না।"

আংটি কিছুই না বুঝে চেয়ে রইল।

মহারাজ একটু হাসলেন। খুবই বিষণ্ণ আর ম্লান দেখাল তাঁর মুখ। মাথাটা নেড়ে বললেন, "আমি পাকেচক্রে পৃথিবীতে এসে পড়েছি বটে, কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যেই গ্রহটাকে ভালও বেসে ফেলেছি। মনে-মনে ভেবেছি, এই গ্রহটাকে ইচ্ছে করলে কত না সুন্দর করে তোলা যায়।"

মহারাজ যেন আবেগভরে একটু চুপ করে রইলেন।

আংটির গলার স্বর আসছিলন না। বেশ একটু কসরত করেই গলায় স্বর ফুটিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোথা থেকে এসেছিলেন?',

মহারাজ মৃদু স্বরে বললেন, "সে আর-এক কাহিনী। পরে কখনও শোনাব। শুধু জেনে রাখো, আমি বিদেশী। বহু কোটি মাইল দূরের আরএক জায়গা থেকে আমি এসেছি।"

আংটি এত অবাক হল যে, হাঁ করে চেয়ে থাকা ছাড়া তার আর কিছুই

করার ছিল না। মহারাজকে গুলবাজ বলে মনে হলে সে এত অবাক হত না। কিন্তু এ-লোকটার গ্র্যানাইট পাথরের মতো কঠিন মুখ, তীক্ষ্ন গভীর চোখ এবং হাবভাবে এমন একটা ব্যক্তিত্বের পরিচয় সে পাচ্ছিল যে, অবিশ্বাস্য হলেও তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল। আর বিশ্বাস করছিল বলেই মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছিল তার।

মহারাজ তাঁর যন্ত্রের দিকে ফের কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে রইলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আংটির দিকে চেয়ে বললেন, "এসো।"

মহারাজ হলঘরটার আর এক প্রান্তে গিয়ে একটা পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। পিছনে যন্ত্রচালিতের মতো হেঁটে এসে আংটিও দাঁড়াল। মহারাজ পর্দাটা হাত দিয়ে সরাতেই একটা টেলিভিশনের মতো বস্তু দেখা গেল। মহারাজ সুইচ টিপতেই পর্দায় নানারকম আঁকিবুকি হতে লাগল।

আংটি বলল, "এটা কী?"

মহারাজ মৃদু স্বরে বললেন, "কয়েকজন বর্বর কী কাণ্ড ঘটাতে চলেছে তা তোমাকে দেখাচ্ছি।"

মহারাজ একটা নব ঘোরালেন। পর্দায় একটা আবছা দৃশ্য ফুটে উঠল। ঘন কুয়াশার মধ্যে কী যেন একটা লম্বাটে জিনিস। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

মহারাজ বললেন, "এই যে আবছা জিনিসটা দেখছ, এটাও পৃথিবী নয়। বহুদূর থেকে এসেছে।"

"এটা কি মহাকাশযান?"

"হ্যাঁ। খুবই উন্নত ধরণের যন্ত্র। শুধু মহাকাশই পাড়ি দেয় না, আরও অনেক কিছু করে।"

পর্দার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে ছিল আংটি। গল্পে উপন্যাসে সে অন্য গ্রহের উন্নত জীবদের নানা কাণ্ড-কারখানার কথা পড়েছে। নিজের চোখে দেখবে তা ভাবেনি। সে স্বপ্ন দেখছে না তো!

পর্দার ছবিটা একটু পরিষ্কার হল। দেখা গেল, বিশাল দৈত্যের আকারের কয়েকটা জীব মহাকাশযানের মস্ত দরজা দিয়ে ওঠানামা করছে। মনে হল তারা কিছু খুচরো জিনিস নামাচ্ছে।

আংটি ভিতু গলায় জিজ্ঞেস করে, "ওরা কারা?"

মহারাজ মৃদু স্বরে বললেন, "ওরা কারা তা আমিও সঠিক জানি না। তবে খুবই উন্নত-বুদ্ধিবিশিষ্ট কিছু বর্বর। বেশ কিছুদিন যাবৎ এরা পৃথিবীতে নানা জায়গায় থানা গেড়ে আছে। সমুদ্রের নীচে, পাহাড়ে, মেরু অঞ্চলে। নানাভাবে এরা পৃথিবীকে পরীক্ষা করে দেখছে।"

"কেন? ওরা কি পৃথিবীর কিছু করবে?"

মহারাজ হেসে বললেন, "শুনলে হয়তো তোমার অবিশ্বাস হবে। আসলে ওরা বোধহয় পৃথিবীকে চুরি করতে চায়।"

"চুরি?"

"ওরা অন্য একটা জগতে থাকে। ওদের বাসও এই তোমাদের সৌরমণ্ডলের মতোই একটি কোনও নক্ষত্রের মণ্ডলে। আমার বিশ্বাস, ওদের মণ্ডলে অনেকগুলো গ্রহ জুড়ে ওরা বসবাস করে। সম্ভবত বাসযোগ্য আরও গ্রহ ওদের দরকার।"

আংটি শিউরে উঠে বলে, "ও বাবা! আমার মাথা ঘুরছে।"

মহারাজ মৃদু হেসে বললেন, "তোমাদের বিজ্ঞান যেখানে আছে, সেখান থেকে ভাবলে এসব প্রায় অবিশ্বাস্যই মনে হয় বটে। তবে আমি যা বলছি, তা তুমি অন্তত অবিশ্বাস কোরো না।"

আংটি নিজের মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে নিয়ে বলল, "ঠিক আছে।"

মহারাজ মৃদু হেসে বললেন, "আমার মনে হয় পছন্দমতো একটা গ্রহ খুঁজে বের করতে ওরা মহাকাশে পাড়ি দিয়ে তোমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে। নানাভাবে পরীক্ষা করে ওরা বুঝেছে যে, এরকম একটা গ্রহ হলে ওদের ভালই হয়। এখন কাজ হল পৃথিবীকে ঠেলে নিজেদের নক্ষত্রের মণ্ডলে নিয়ে যাওয়া। ওদের পক্ষে তেমন কিছু শক্ত কাজ নয়।"

আংটি আতঙ্কিত হয়ে বলল, "তা হলে আমাদের কী হবে? এত মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা?"

"সৌরমণ্ডল থেকে ছিটকে গেলে পৃথিবীর উপরিভাগের সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। নষ্ট হয়ে যাবে আবহমণ্ডল! দারুণ ঠাণ্ডায় সব জমে পাথর হয়ে যাবে। ওরা ওদের নক্ষত্রমণ্ডলে নিয়ে গিয়ে পৃথিবীতে আবার আবহমণ্ডল তৈরি করবে। আমার বিশ্বাস, ওরা পৃথিবীকে ওদের কৃষি-গ্রহ হিসেবে ব্যবহার করবে। আমাদের নিজেদের মণ্ডলে আমরাও এক-একটা গ্রহকে এক-এক কাজে ব্যবহার করি।"

আংটি সবিস্ময়ে বলে, "তোমাদের ক'টা গ্রহ আছে?"

"একান্নটা। তাতে আমাদের কুলোয় না। কিন্তু তা বলে আমরা মানুষজন গাছপালা-সহ কোনও গ্রহ চুরির কথা ভাবতেও পারি না। ওরা বর্বর বলেই এরকম নৃশংস কাজ করতে পারে।"

"এখন তা হলে কী হবে?"

মহারাজ চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "সেটাই ভাবছি। বেশ কিছুদিন আগে আমি একটি দুর্ঘটনায় পড়ে, তোমাদের পৃথিবীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হই। আমার মহাকাশযান অকেজো হয়ে গেছে, মেরামত করতে অনেক সময় লাগবে। আমার কাছে এখন তেমন কোনও অস্ত্রশস্ত্র নেই, যা দিয়ে বর্বরদের মোকাবিলা করা যায়।"

আংটি আশান্বিত হয়ে বলল, "কিন্তু আমাদের অ্যাটম বোমা আছে, হাইড্রোজেন বোমা আছে, নাইট্রোজেন বোমা আছে।"

মহারাজ মাথা নেড়ে বললেন, "সে-সব আমি জানি। বর্বররাও সব খবর রাখে। তোমাদের কোনও অস্ত্রই কাজে লাগবে না। ওরা সবই সময়মতো

অকেজো করে দেবে। পৃথিবীর কোথায় কী আছে, তার সব খবরই ওদের নখদর্পণে। ওরা তোমাদের কোনও সুযোগই দেবে না। আজ ওদের যে মহাকাশযান এসেছে, তাতে কিছু অদ্ভুত যন্ত্রপাতি আছে। এগুলো ওরা ভূগর্ভে পাঠিয়ে দেবে। ওরা নিজেরা মহাকাশযানে উঠে বেশ কিছু দূরে গিয়ে ভূগর্ভের যন্ত্রকে নির্দেশ পাঠাবে। তারপর কী হবে জানো?"

আংটি সভয়ে বলল, "কী হবে?"

"ওই যন্ত্রগুলোর প্রভাবে পৃথিবী নিজেই কক্ষচ্যুত হয়ে ওদের মহাকাশযানের নির্দেশমতো চলতে শুরু করবে এক নির্বাসনযাত্রায়।"

"উরেব্বাস!"

"ভয় পেও না। আমি এখনও আছি। এ-ঘটনা এত সহজে ঘটতে দেব না। তবে তোমাদের সাহায্য চাই।"

আঠাশ

নাড়ি দেখে পঞ্চানন্দ বুঝল, গজ-পালোয়ানের শরীরটা যতই ফুলে উঠুক তার প্রাণের ভয় নেই। তবে জ্ঞান কখন ফিরবে তা বলা যায় না। গজ'র গা থেকে একটা ভারী মিষ্টি গন্ধ আসছে। লোকটাকে এই জলকাদায় এরকম অসহায় অবস্থায় ফেলে যেতে একটু মায়া হল তার। তাই নিচু হয়ে দু' বগলের নীচে হাত দিয়ে প্রাণপণে সে শরীরটা টেনে একটু ওপরে তোলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু অত বড় লাশকে নড়ায় কার সাধ্যি? পঞ্চানন্দর গা দিয়ে ঘাম বেরোতে লাগল, ঘনঘন শ্বাস পড়তে লাগল, কোমর টনটন করতে লাগল বৃথা পরিশ্রমে। আচমকাই পিছন থেকে কে যেন তার কাঁধে দুটো টোকা দিল।

পঞ্চানন্দ চমকে একটা লাফ দিয়ে বলে উঠল, "আমি না. আমি কিছু করিনি।"

অন্ধকারে মৃদু একটু হাসি শোনা গেল! কে যেন বলে উঠল, "তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু ওই গোরিলাটা তোমার কে হয়?"

পঞ্চানন্দ ঘড়িকে দেখে একগাল হাসবার চেষ্টা করল। কিন্তু হাসিটা ভাল ফুটল না। মাথা চুলকে বলল, "আজ্ঞে, বললে পেত্যয় যাবে না, ইটি হল গে আমাদের গজ-পালোয়ান। কিন্তু আঙুল ফুলে কী করে যে কলাগাছ হল সেটিই মাথায় আসছে না।"

বলে পঞ্চানন্দ টর্চটা জ্বেলে গজ-পালোয়ানের মুখে আলো ফেলল।

ঘড়ি একটু ঝুঁকে ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, "অবাক কাণ্ড! এ তো গজদাই দেখছি বেঁচে আছে নাকি?"

"আছে আজ্ঞে। নাড়ি চলছে, শ্বাস বইছে, কিন্তু একে কি বেঁচে থাকা বলে? তবে সে চিন্তা পরে। আপাতত গজকে জল থেকে তোলা দরকার।"

ঘড়ি ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবল। ঘটনাটা খুবই বিস্ময়কর। গজ-পালোয়ান এত অল্প সময়ের মধ্যে এরকম পেল্লায় হয়ে উঠল নিশ্চয়ই কোনও কঠিন

অসুখে। কিংবা অন্য কোনও রহস্যময় কারণে। ঘড়ি তার হাতে রুমালের পেঁটলাটার দিকে একবার তাকাল। কলের কঁকড়াবিছেটাতে সে রুমালের ফাঁসে আটকে রেখেছে। বিছেটা নড়াচড়া বন্ধ করেছে। তবে মিষ্টি গন্ধটায় এখনও ম' ম' করছে রুমালটা। ভারী নেশাড়ু গন্ধ। মাথা ঝিমঝিম করে। রুমালটা মাটিতে রেখে সে গজকে তোলার জন্য পঞ্চানন্দর সঙ্গে হাত লাগাল।

কাজটা বড় সহজ হল না। জলকাদায় পা রাখাই দায়। তারপর ওই বিরাট লাশকে টেনে ঢালু বেয়ে তোলা। দুজনেই গলদঘর্ম হয়ে গেল এই শীতের রাতেও।

ডাঙায় তুলে পঞ্চানন্দ আর ঘড়ি ভাল করে গজ-পালোয়ানকে পরীক্ষা করে দেখল। কেউ কিছু বুঝতে পারল না। তবে গজ'র গা থেকে সেই ম' ম' করা মিষ্টি গন্ধটা পাচ্ছিল ঘড়ি। সে গিয়ে তার ফাঁস-দেওয়া রুমালটা ফের শুঁকল। একই গন্ধ।

পঞ্চানন্দ তার দিকেই চেয়ে ছিল। বলল, "কিছু বুঝতে পারলেন ?"

ঘড়ি মাথা নেড়ে বলল, "বড্ড ধাঁধা ঠেকছে !"

"রুমালটার মধ্যে কী বেঁধে রেখেছেন ?"

"একটা সবুজে কাঁকড়াবিছে। আসল নয়। নকলের।"

পঞ্চানন্দ গম্ভীর হয়ে বলল, "হুঁ।"

"কিছু বুঝলেন ?"

পঞ্চানন্দ দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বলল, "আজ্ঞে না।"

"তা হলে বিজ্ঞের মতো হুঁ বললেন যে ?"

পঞ্চানন্দ মৃদু হেসে বলল, "আজ্ঞে আপনি আমাকে খামোখা 'আপনি' 'আজ্ঞে' করতে লেগেছেন কেন ?"

"আগে কথাটার জবাব দিন।"

পঞ্চানন্দ উদাস গলায় বলল, "হুঁ হাঁ লোকে অমন কত বলে, সবসময়ে কারণ থাকে না।"

"আমার কী মনে হয় জানেন ? বাইরে থেকে আপনাকে যাই মনে হোক না কেন আপনি আসলে একটি ঘুঘু লোক।"

পঞ্চানন্দ তেমনি উদাসভাবে বলল, "আজ্ঞে আমার তেমন সুনাম নেইও। সবাই ওরকম সব বলে আমার সম্পর্কে। তা ঘুঘুই বোধহয় আমি। কিন্তু এসব কথা পরেও হতে পারবে। ওদিকে কী একটা যেন কাণ্ড হচ্ছে। ওটাও একটু দেখা দরকার।"

"ফ্লাইং সসার তো! আমরাও ওটাই দেখতে বেরিয়েছিলাম। কোন্‌খানে নামল বলুন তো ?"

"বেশি দূর বোধহয় নয়। গজ আপাতত এখানেই থাক। এ-লাশ তো এখন নড়ানো যাবে না। আমার সঙ্গে আসুন।"

পঞ্চানন্দ চলতে শুরু করল। পিছনে ঘড়ি।

বেশি দূরে যেতে হল না। জলার ধারে ঘন ঝোপঝাড় ভেদ করে কিছু দূরে এগোবার পরই পঞ্চানন্দ দাঁড়িয়ে মাথাটা নামিয়ে ফেলে বলল, "ওই যে। উরে বাবা, এ তো দেখছি রাক্ষস-খোক্কশের বৃত্তান্ত!"

ঘড়িও দেখল। তার মুখে কথা সরল না।

জলার মাঝ-বরাবর জলের মধ্যেই একখানা বিশাল চেহারার পটলের মতো বস্তু। দেখতে অনেকটা আদ্যিকালের উড়োজাহাজ জেপলিনের মতো। অন্ধকারে চোখ সয়ে গেছে বলে এবং শেষ রাতের দিকে কুয়াশা ভেদ করে ম্লান একটু জ্যোৎস্নাও দেখা দিয়েছে বলে বস্তুটা দেখা গেল। কিন্তু উড়ন্ত চাকির চেয়েও বিস্ময়কর হল কয়েকজন দানবাকৃতি জীব সেই মহাকাশযান থেকে কী যেন সব বড়-বড় যন্ত্রপাতি নামাচ্ছে।

পঞ্চানন্দ, চাপা গলায় বলল, "কিছু বুঝলেন?"

"না। এরা কারা?"

পঞ্চানন্দ একটা শ্বাস ফেলে বলল, "এদের আমি আগেও দেখেছি। শিবু-বাবুর ল্যাবরেটরি থেকে এরাই গজকে ধরে নিয়ে যায়। খুব সুবিধের লোক বোধহয় এরা নয়। গজও ছিল না।"

"তার মানে? গজদা আবার কী করেছে?"

"সে লম্বা গল্প। শুধু বলে রাখি, গজ এখানে এসে থানা গেড়েছিল একটা মতলবে' সে-মতলব হাসিল হয়েছে কি না জানি না। যদি হয়েও থাকে বেচারা কর্মফলে ফেঁসে গেছে। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে কি না।"

"এরা গজদাকে দাদুর ল্যাবরেটরি থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তা আপনি জানলেন কী করে? গজদাই বা ওখানে কী করছিল?"

"ফের এক লম্বা গপ্পের ফেরে ফেললেন। এখন অত কথার সময় নেই। তবে ঘটনাটা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আপনার দাদুর ল্যাবরেটরিতে সে প্রায়ই ঢুকত। তবে লুকিয়েচুরিয়ে। এবার ঢুকেছিল ন্যাড়াবাবুকে বলে। কিন্তু বেচারার কপালটাই খারাপ।"

"দাদুর ল্যাবরেটরিতে কী আছে?"

"তার আমি কী জানি! আমি মুখ্যু লোক, তিনি পণ্ডিত।"

আপনি অনেক কিছুই জানেন। ঘুঘু লোক।"

মাথা চুলকে পঞ্চানন্দ বলল, "আমি একরকম তাঁর হাতেই মানুষ তো। তাই একটু-আধটু জানি বইকী! তবে বেশি নয়।"

ঘড়ি একটু হেসে বলল, "আপনি মোটেই আমার দাদুর হাতে মানুষ নন। আমার সন্দেহ হয় আপনি তাঁকে চিনতেনই না।"

"শিবু হালদার মশাইকে কে না চেনে! প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি।"

"নামে কেউ কেউ চিনতে পারে। কিন্তু আপনি সেরকম লোক নন।"

"আচ্ছা সে-তর্ক পরে হবে'খন। এখন সামনে যা হচ্ছে তার কী করবেন?"

ঘড়ি মাথা নেড়ে বলল, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না।"

"কিছু কিন্তু করা উচিত। এই দানবগুলোর মতলব ভাল নয়।"

কার্যত অবশ্য কে কী করবে বুঝতে না পেরে চেয়ে রইল।

পঞ্চানন্দ লোকটার ওপর হরিবাবুর বেশ আস্থা এসে গেছে? কাজের লোক। হাতে রাখলে মেলা উপকার হবে।

হরিবাবু আজ প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কবিতা লিখে বায়ু এমন চড়িয়ে ফেলেছেন যে ঘুম আর আসছে না। ঘরময় পায়চারি করে করে পায়ে ব্যথা হয়ে গেল।

হঠাৎ তাঁর মনে হল, ঘরে হাঁটাহাঁটি না করে প্রাতঃভ্রমণ করে এলে কেমন হয়? প্রাতঃকাল অবশ্য এখনও হয়নি। কিন্তু ভ্রমণ করতে করতে একসময়ে প্রাতঃকাল হবেই। না হয়ে যাবে কোথায়? তা ছাড়া বাইরে এখন বেশ পরিষ্কার বাতাস বইছে, ভাবটাব এসে যেতে পারে। চাই কী নিশুত রাতের ওপর একখানা কবিতা নামিয়ে ফেলতে পারবেন।

হরিবাবু আর দেরি করলেন না। গা ঢেকে বাঁদুরে টুপি পরে, মোজা-জুতো পায়ে দিয়ে তৈরি হয়ে নিলেন। তাঁর মনের মধ্যে কয়েকটা শব্দ ভ্রমরের মতো গুনগুন করছিল। "ঈশান কোণ, তিন ক্রোশ, ঈশান কোণ, তিন ক্রোশ।" প্রথমটায় কথাগুলোকে তাঁর একটা না-লেখা কবিতার লাইন বলে মনে হচ্ছিল। ক্রোশের সঙ্গে কোন্ শব্দটা মেলানো যায় তাও ভাবছিলেন। বোস, তোষ, মোষ, ঘোষ, ফোঁস অনেক শব্দ আসছিল মাথায়। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এটা একটা সংকেত-বাক্য। পঞ্চানন্দ বলেছিল। একটা চাবিও দিয়েছিল বটে।

চাবিটা টেবিলের দেরাজে পেয়ে গেলেন হরিবাবু। ঈশান কোণও তাঁর জানা। তিন ক্রোশ পথটা একটু বেশি বটে, কিন্তু ক্রোশ মানে কি আর সত্যিই ক্রোশ?

আসলে এক ক্রোশ ঠিক কতটা পথ তা হরিবাবুর মনে পড়ল না। কিন্তু এই সামান্য সমস্যা নিয়ে কালহরণ করাও তাঁর উচিত বলে বিবেচনা হল না। তিনি চাবিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

ঈশান কোণ ঠিক করে নিতে তাঁর মোটেই দেরি হল না। পঞ্চানন্দ লোক-টাকে তাঁর মোটেই অবিশ্বাস হয় না। মিথ্যেকথা বলে হয়তো, গুলগপ্পোও ঝাড়তে পারে, চুরি-টুরির বদ অভ্যাস যে নেই তা বলা যায় না, পেটুকও বটে, কিন্তু তবু মন্দ নয়। কবিতা জিনিসটাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে।

হরিবাবু হনহন করে হাঁটা ধরলেন। মনটায় বেশ স্ফূর্তি লাগছে। চাঁদও উঠে পড়েছে একটু। কুয়াশায় চারদিকটা বেশ স্বপ্নময়। এরকমই ভাল লাগে হরিবাবুর। চাঁদ থাকবে, কুয়াশা থাকবে, কবিতা থাকবে, তবে না।

হাঁটতে হাঁটতে হরিবাবু আত্মহারা হয়ে গেলেন। কোন্‌দিকে যাচ্ছেন তাঁর খেয়াল রইল না।

ঊনত্রিশ

একটা হোঁচট খাওয়ার পর হরিবাবুকে থেমে পড়তে হল। পড়েই যাচ্ছিলেন। কোনও রকমে সামলে নিয়ে চারিদিকটা খেয়াল করে যা দেখলেন, তাতে বেশ অবাক হওয়ার কথা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি ঈশান কোণ লক্ষ্য করে হাঁটা ধরেছিলেন। এতক্ষণে মাইলটাক দূরে গিয়ে পেঁছিনোর কথা। কিন্তু মাথায় কবিতার পোকা ওড়াউড়ি করছিল বলে দিক ভুল করে তিনি ফের নিজের বাড়ির মধ্যেই ফিরে এসেছেন যেন!

হ্যাঁ, এটা তাদেরই বাড়ি বটে। ওই তো সামনে ঝুপসি কেয়াঝোপ। তার ওপাশে তাঁর বাবার ল্যাবরেটরি। তারপর বাগান, তার ওপাশে তাঁদের বাড়িটা। ফটফটে জ্যোৎস্নায় সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

হরিবাবু একটু অপ্রতিভ বোধ করলেন। লজ্জা পেয়ে একা একাই জিভ কাটলেন তিনি।

ভোর হতে এখনও ঢের দেরি। হরিবাবু বাগানের মধ্যেই কিছুক্ষণ হাঁটা-হাঁটি করলেন। গুনগুন করে গান গাইলেন একটু। কবিতার লাইনও ভাববার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মাথায় তেমন কোনও লাইন এল না।

তিনি কবিতার মানুষ। সেইজন্যই বোধহয় নিজের বাবার ল্যাবরেটরিতে তিনি বিশেষ ঢোকেননি। বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকাণ্ডে তাঁর তেমন আগ্রহ নেই। তবে পঞ্চানন্দ শিবু হালদারের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যে-সব গল্প তাঁকে শুনিয়েছে, তা যদি সত্য হয় তবে বিজ্ঞান জিনিসটা বিশেষ খারাপ নয় বোধহয়। বিজ্ঞান বিষয়ে দু' একটা কবিতাও লিখে ফেলা বোধহয় সম্ভব।

ভাবতে ভাবতে তিনি ল্যাবরেটরিটার দিকে এগোলেন। দেখলেন দরজাটা ভেজানো থাকলেও তালা লাগানো নেই। বস্তুত ভাঙা তালাটা মেঝের ওপর পড়ে ছিল। কিন্তু হরিবাবু সেটা লক্ষ্য না করে ঘরে ঢুকলেন। তার-পর বাতি জ্বালালেন। চারিদিকটা বেশ অগোছালো হয়ে আছে। দেরাজ খোলা, আলমারি হাঁটকানো, যন্ত্রপাতিও অনেকগুলো চিত বা কাত হয়ে পড়ে আছে।

হরিবাবু তাঁর বাবার গবেষণাগারটি হাঁ হয়ে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর এটা-ওটা একটু-একটু করে নেড়ে চড়ে দেখতে লাগলেন। অবশ্য কিছুই তেমন বুঝতে পারলেন না।

এই ল্যাবরেটরিতে তিনি ছেলেবেলায় মাঝে-মাঝে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে ঢুকে পড়তেন। কাজের সময় ছেলেপুলেদের উৎপাতে বিরক্ত হলেও শিবুবাবু তেমন কিছু বলতেন না ছেলেকে। বহুকাল বাদে বাবার কথা মনে পড়ায় বাবুর চোখ দুটো সজল হয়ে উঠল।

হরিবাবুর মনে পড়ল, একবার দেয়াল-আলমারির মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন লুকোতে গিয়ে। নীচের তাকটা বেশ বড়ই ছিল। তার মধ্যে থাকত পুরনো সব কাগজপত্র। তার মধ্যে লুকোতে খুব সুবিধে। তা সেই রকম লুকিয়ে আলমারির দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ বাঁ ধারে একটা বোতামের মতো দেখতে পেয়ে সেটা খুঁটতে শুরু করেছিলেন। তখন হঠাৎ পিছনের দেয়ালটা হড়াস করে খুলে গেল। আর হরিবাবু উলটে একটা চৌকো-মতো গর্তে পড়ে গেলেন। তেমন যে চোট পেয়েছিলেন, তা নয়। কিন্তু লুকোনো গর্ত আবিষ্কার করে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। শিবুবাবুই ওঁকে টেনে তুলেছিলেন গর্ত থেকে।

অনেক দিন কেটে গেছে। সেই লুকোচুরি খেলা, সেই গর্তে পড়ে যাওয়ার কথা ভেবে আজ হরিবাবুর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ অশ্রু বিসর্জনের পর হরিবাবু চোখ মুছলেন। দেয়াল-আলমারিটা এখনও তেমনি আছে। হরিবাবু সেটা খুলে ডাঁই করা পুরনো কাগজপত্র সরিয়ে বোতামটা বের করলেন। আজ আবার তাঁর সেইরকম লুকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে।

ইচ্ছেটা এমনই প্রবল হয়ে উঠল যে, হরিবাবু নিজেকে আটকে রাখতে পারলেন না। হামাগুড়ি দিয়ে পুরনো কাগজপত্র ঠেলে অন্যধারে সরিয়ে ঢুকে পড়লেন ভিতরে। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে থাকতে তাঁর নিজেকে ফের শিশু বলে মনে হতে লাগল। বয়স যেন অনেক বছর কমে গেছে।

বেখেয়ালে তিনি দেয়ালের গায়ে বোতামটাকে খুঁটতে লাগলেন।

ঘটনাটা এমন আচমকা ঘটল যে, হরিবাবু সাবধান হওয়ার কোনও রকম সুযোগই পেলেন না। সেই বহুকাল আগের মতোই পিছনে একটা ফোকর হঠাৎ দেখা দিল এবং হরিবাবু হড়াস করে একটা চৌকো গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন।

তবে বয়সটা আর তো সত্যিই অত কম নয়। সেবার পড়ে গিয়ে তেমন ব্যথা পাননি। এবারে পেলেন। মাথাটায় ঝং করে কী যেন লাগল। ঝিমঝিম করে উঠল মাথা। চোখে কিছুক্ষণ অন্ধকার দেখলেন হরিবাবু।

গর্তটা মাঝারি মাপের। অনেকটা জলের চৌবাচ্চার মতো। অন্ধকারে খুব ভাল করে কিছু বোঝা যায় না।

পতনজনিত ভ্যাবাচ্যাকা ভাব আর ব্যথার প্রথম তীব্রতাটা কাটিয়ে উঠে হরিবাবু হাতড়ে-হাতড়ে চারদিকটা দেখলেন। একটা গোল ছোট বলের মতো জিনিস তাঁর হাতে ঠেকল। তিনি বস্তুটা কুড়িয়ে নিলেন। খুবই ভারী জিনিসটা। আর বলের মতো মসৃণ নয়। বস্তুটার গায়ে নানারকম খাঁজ আর ছোট-ছোট টিপ-বোতামের মতো কী সব যেন লাগানো আছে।

হরিবাবু জিনিসটা পকেটে পুরে ধীরেসুস্থে উঠে পড়লেন। হামাগুড়ি

দিয়ে বাইরে এসে গর্তটার কপাট আঁটলেন। তারপর আলমারি বন্ধ করে ল্যাবরেটরির আলো নিবিয়ে দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

ব্রাহ্মমুহূর্তটা পড়াশুনোর পক্ষে খুবই ভাল সময়। হরিবাবু ভাবলেন, এখন ঘড়ি আর আংটিকে ঘুম থেকে তুলে দেবেন। তারপর পঞ্চাননকে ডেকে নিয়ে ফের একবার বেড়াতে বেরোবেন। অবশ্য হাতে ঘড়ি না থাকায় হরিবাবু বুঝতে পারছিলেন না, এখন ঠিক ক'টা বাজে। যটাই বাজুক, ব্রাহ্মমুহূর্তটা আজ তিনি পেরোতে দেবেন না কিছুতেই।

দোতলায় উঠে তিনি ছেলেদের ঘরে গিয়ে হানা দিলেন।

"এই ওঠ, ওঠ, পড়তে বসে পড়। আর দেরি করা ঠিক নয়।"

ডাকতে গিয়ে হরিবাবু দেখে খুশিই হলেন যে, ছেলেরা কেউ বিছানায় নেই। তার মানে দুজনেই উঠে পড়েছে। এই তো চাই।

একতলায় নেমে এসে হরিবাবু পঞ্চাননের খোঁজ করতে গিয়ে দেখেন, সেও বিছানায় নেই।

বাঃ। সকলেই ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে পড়ছে আজকাল। এ তো খুবই ভাল লক্ষণ!

হরিবাবু আর দেরি করলেন না। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন।

রাস্তাঘাট তিনি ভালই চেনেন। কিন্তু অন্যমনস্কতার দরুন এক রাস্তায় যেতে আর-এক রাস্তায় চলে যান। এ ছাড়া তাঁর আর কোনও অসুবিধে নেই।

আজও হাঁটতে হাঁটতে ব্রাহ্মমুহূর্ত নিয়ে একটা কবিতা লেখার কথা ভাবতে লাগলেন। ভাবতে-ভাবতে রাস্তাঘাট ভুল হয়ে গেল। তিনি সম্পূর্ণ অচেনা একটা জায়গায় চলে এলেন।

মহারাজ টিভির মতো যন্ত্রটা বন্ধ করে দিয়ে আংটির দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি খুব ঘাবড়ে গেছ, না?"

আংটি সত্যিই ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। রূপকথার গল্পেও এরকম ঘটনার কথা নেই। গোটা পৃথিবীটাকে চুরি করে নিয়ে যেতে চায় কিছু লোক. এ কি সম্ভব?

শিহরিত হয়ে আংটি বলল, "আপনি আসলে কে, আমাকে বলবেন?"

মহারাজ হাসলেন। বললেন, "আর যাই হই আমি গুলবাজ নই। আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।"

আংটি কাঁপতে-কাঁপতে বলল, "আপনি আমাদের বাঁচানোর জন্য কিছু করতে পারেন না?"

মহারাজ ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "চেষ্টা নিশ্চয়ই করব। কিন্তু বিপদ কী জানো? এদের ধ্বংস করার মতো যে অস্ত্র আমার কাছে আছে, তা প্রয়োগ করলে পৃথিবীও ধ্বংস হয়ে যাবে।"

আংটি হঠাৎ এই প্রসঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা প্রশ্ন করল, "আপনি

অন্য গ্রহের মানুষ হয়েও এমন চমৎকার বাংলা শিখলেন কী করে?"

মহারাজ একটু হেসে বললেন, "শুধু বাংলা নয়, পৃথিবীর অনেক ভাষাই আমাকে শিখতে হয়েছে। তোমরা ভাষা শেখো, আমরা শিখি ধ্বনি। আমাদের মাথাও অবশ্য একটু বেশি উর্বর। শিখতে সময় লাগে না। তা ছাড়া আছে অনুবাদযন্ত্র। যে-কোনও ভাষাই তুমি বলো না কেন, তা আমার ভাষায় অনুবাদ হয়ে আমার কানে পৌঁছবে আমার ভাষা তোমার ভাষায় অনুবাদ হয়ে যাবে।"

আংটির মাথার একটা স্মৃতি খেলা করে গেল। সে রামরাহা নামে একজন লোকের কথা কোনও বইতে পড়েছিল। এই সেই রামরাহা নয় তো!

আংটিকে কিছু বলতে হল না। মহারাজ নিজেই একটু মুচকি হেসে বললেন, "ঠিকই ধরেছ। আমিই সেই রামরাহা।"

"আপনি একশো মাইল স্পিডে দৌড়োতে পারেন! দশ ফুট হাইজাম্প দিতে পারেন!"

মহারাজ হাত তুলে বললেন, "ব্যস, থামো। তোমার কাছে যেটা বিস্ময়কর ক্ষমতা বলে মনে হচ্ছে, আমাদের কাছে তা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।"

"আপনি তো ইচ্ছে করলেই ওই বর্বরদের ঠাণ্ডা করে দিতে পারেন।"

রামরাহা দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "না আংটি, এই বর্বররা আমার চেয়ে কম ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু সে-কথা যাক। আমার কাছে একটা অত্যন্ত সেনসিটিভ ট্রেসার আছে। তা দিয়ে পৃথিবীর কোথায় কোন্ শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে বা ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সেগুলো ধরা যায়। কয়েকদিন আগে ট্রেসারে আমি একটা কাঁপন লক্ষ্য করি। মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে এমন একটা যন্ত্র বা শক্তির উৎস আছে যা অকল্পনীয়। আমি সেই উৎসের সন্ধানে খুঁজে-খুঁজে যন্ত্রের নির্দেশে এখানে এসে হাজির হই। এখানেই আস্তানা গেড়ে কয়েকদিন হল বসে আছি। বুঝতে পারছি উৎসটা এখানেই কোথাও আছে। কিন্তু ঠিক কোথায় তা বুঝতে পারছি না। আশ্চর্যের বিষয় যখন ক্রিকেট খেলার মাঠের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন ট্রেসারে সেই কম্পন ধরা পড়ে। তোমাদের গা থেকে সেই শক্তির একটা আভাস আসছিল। সেজন্যই তোমাদের দু' ভাইকে তুলে এনেছিলাম। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিলাম, তোমাদের কাছে জিনিসটা নেই।"

"কীভাবে বুঝলেন?"

"তোমাদের মগজ এক্স-রে করে।"

ত্রিশ

আংটি আমতা আমতা করে বলল, "কিন্তু আমাদের কাছে তো ওরকম কিছু নেই।"

মহারাজ অর্থাৎ রামরাহা একটু হেসে বললেন, "হয়তো আছে, কিন্তু

তোমরা জানো না। হয়তো নয়, অবশ্যই আছে। কিন্তু জিনিসটা ঘুমন্ত। ওর ভিতর থেকে সূক্ষ্ম একটা বিকিরণ সব সময়েই ঘটছে। কিন্তু বিকিরণটা এতই সামান্য যে, ধরা মুশকিল। তোমরা যে-বাড়িতে থাকো তারই কোথাও লুকনো আছে। কিন্তু সেটা খুঁজে দেখার সময় আমি পাইনি। সময় বোধহয় আর পাবও না। এখন আমার হাতে যেটুকু ক্ষমতা আছে সেটুকুই কাজে লাগাতে হবে। চলো, আর সময় নেই।"

এই বলে মহারাজ উঠে পড়লেন।

হরিবাবু যেখানটায় এসে পড়েছেন, সেটা যে একটা জলা তা তাঁর খেয়াল হল পায়ে ঠাণ্ডা লাগায়। এতক্ষণ বেশ ব্রাহ্মমুহূর্তে পবিত্রতার কথা ভাবতে ভাবতে মনটা উড়ু-উড়ু করছিল। কিছু কবিতার লাইনও চলে আসছিল মাথায়।

ত্যাগ করো লোকলজ্জা,
ভোরবেলা ছাড়ো শয্যা,
করো কব্জা ব্রাহ্মমুহূর্তেরে,
ঝরাও ঘর্ম, ধরো কর্ম,
সঙ্গী হবেন পরব্রহ্ম,
এলেন বলে লক্ষ্মী তেড়েফুঁড়ে।

এর পরেও কবিতাটা চলত। কিন্তু ঝপাং করে হাঁটুভর যমঠাণ্ডা জলে আচমকা নেমে পড়লে কোনও কবিরই ভাবটাব থাকে না। হরিবাবুরও তাল কেটে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। কবির পথে যে কত বাধা তা আর বলে শেষ করা যায় না।

অন্য কেউ হলে জল থেকে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে উঠে পড়ত। কিন্তু হরিবাবু সেরকম লোক নন। জলে নেমে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঠাণ্ডায় ঝনঝন করে উঠলেও তিনি পিছু হটলেন না। ছেলেবেলায় এই জলায় তিনি কতবার মাছ ধরতে এসেছেন। জলার মাঝখানটা তখন বেশ গভীর ছিল। নিতাই নামে একটা লোকের একখানা ডিঙি নৌকো বাঁধা থাকত ধারে। বহুবার সেই নৌকো বেয়ে জলায় ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। আজ নৌকো নেই, কিন্তু···

কিন্তু জাহাজ আছে!

হরিবাবু খুবই অবাক হয়ে গেলেন। জলার মধ্যে বেশ খানিকটা জলকাদা ভেঙে তিনি আপনমনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। নিতাইয়ের ডিঙি নৌকোর কথাটা বারবার মনে আসছে। এমন সময় দেখলেন, জলার মধ্যে বাস্তবিকই মস্ত এক জাহাজ। না, একেবারে হুবহু জাহাজের মতো চেহারা নয়। মাস্তুল-টাস্তুল নেই। কেমন একটু লেপাপোঁছা চেহারা। তা হোক, তবু এ যে জাহাজ তাতে সন্দেহ নেই।

বিস্ময়টা বেশিক্ষণ রইল না হরিবাবুর। ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠলে কত কী হয়,

কত অসম্ভবই সম্ভব হয়ে ওঠে তার কি কিছু ঠিক আছে! তবে স্বয়ং ব্রহ্মাই যে হরিবাবুর মনের ইচ্ছে টের পেয়ে নৌকোর বদলে আস্ত একখানা জাহাজ পাঠিয়ে দিয়েছেন, এ বিষয়ে তাঁর আর কোনও সন্দেহ রইল না।

হরিবাবু জল ভেঙে যতদূর সম্ভব দ্রুত জাহাজটার দিকে এগোতে লাগলেন।

জাহাজের লোকজন যেন হরিবাবুর জন্যই অপেক্ষা করছিল। করারই তো কথা কিনা। তবে লোকগুলোর চেহারা-ছিরি হরিবাবুর বিশেষ পছন্দ হল না। বড্ড নড়সড় আর বেজায় হোঁতকা। সংখ্যায় তারা জনা চার-পাঁচ হবে। হরিবাবু জাহাজটার কাছে হাজির হতেই লোকগুলো হাতের কাজ ফেলে তাঁর দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। হরিবাবু তাদের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, "বাঃ, বেশ জাহাজখানা তোমাদের!"

ঠিক এই সময় অনেকটা দূর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, "বাবা, পালিয়ে এসো! ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।"

হরিবাবু একটু থেকে চারদিকে চাইলেন। গলাটা তাঁর বড় ছেলে ঘড়ির বলে মনে হল! কিন্তু ঘড়ি কেন চেঁচাচ্ছে তা তাঁর মাথায় ঢুকল না।

হরিবাবুও চেঁচিয়ে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই দু'মন ওজনের একখানা থাবা এসে ক্যাঁক করে তাঁর ঘাড়খানা ধরে এক ঝটকায় শূন্যে তুলে নিল। হরিবাবু চোখে অন্ধকার দেখলেন।

ভাল করে কিছু বুঝবার আগেই সেই বিশাল হাতখানা একখানা ক্রেনের মতো তাঁকে শূন্যে ভাসিয়ে সেই জাহাজখানার ভিতরে একটা চৌকো বাক্সের মতো ঘরে নিক্ষেপ করল।

হরিবাবুর কিছুক্ষণের জন্য মূর্ছার মতো হয়েছিল। তারপর চোখ মেলে চাইতেই তিনি দেখলেন, তাঁর আশেপাশে আরও বেশ জনাকয় লোক রয়েছে। দু'চারজনকে তিনি চেনেনও। যেমন লোহার কারিগর হরিদাস, পটুয়া বক্রেশ্বর, আতরওয়ালা ইক্রাম, হালুইকর গণেশ, রামজাদু স্কুলের বিজ্ঞানের মাস্টার যতীন ঘোষ। আরও অনেকে।

যতীনবাবুই হরিবাবুকে দেখে এগিয়ে এলেন। মুখখানা শুকনো, চোখে আতঙ্ক। বললেন, "এসব কী হচ্ছে মশাই?"

হরিবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "কিছুই বুঝতে পারছি না। মনের ভুলে জলায় নেমে জাহাজ দেখে এগিয়ে এসেছি, অমনি ধরে আনল।"

যতীনবাবু ধরা গলায় বললেন, "আমিও রাতে একটু বাথরুমে গিয়েছিলুম। বাইরে একটা অদ্ভুত আলো দেখে বেরিয়ে আসি। জলায় আলো জ্বলছে দেখে ব্যাপারটা তদন্ত করতে এসে পড়েছিলুম। তারপর এই তো দেখছেন।"

"এরা সব কারা?"

"মানুষ নয়। ভূত যদি বা হয় তবে বেশ শক্ত ভূত। সেই কখন থেকে এক নাগাড়ে রাম-রাম করে যাচ্ছি, কোনও কাজই হচ্ছে না।"

হরিবাবু চারদিকে চেয়ে দেখলেন। ঘরখানায় দেখার অবশ্য কিছু নেই। লোহার মতোই শক্ত কোনও ধাতু দিয়ে তৈরি মসৃণ দেয়াল। ছাদখানা বেশ নিচু। তাতে কয়েকটা অদ্ভুত রকমের আলো জ্বলছে। ঘরের মেঝেখানাও ধাতুর তৈরি। তবে ঘরখানা বেশ গরম। বাইরের ঠাণ্ডা মোটেই টের পাওয়া যাচ্ছে না।

হরিবাবু হঠাৎ যতীনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, জাহাজের সঙ্গে মেলানো যায় এমন কোনও শব্দ মনে পড়ছে?"

"জাহাজ!" বলে যতীনবাবু অবাক হয়ে তাকালেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "আজ্ঞে না। রাম-নাম ছাড়া আর কোনও শব্দই আমার মাথায় নেই কিনা। কিন্তু, আপনি কি এখনও কবিতার কথা ভাবছেন? এই দুঃসময়ে, এত বিপদের মধ্যেও?"

হরিবাবু একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, "কী জানেন, একবার কবি হয়ে জন্মালে আর কবিতা কিছুতেই ছাড়তে চায় না। শত বিপদ, শত ঝড়ঝঞ্ঝা, এমনকী মৃত্যুর মুখেও কবিতার লাইন গুনগুন করবেই মাথায়। ওয়ানস এ পোয়েট অলওয়েজ এ পোয়েট।"

যতীনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "তাই তো দেখছি। কিন্তু কবিতা দিয়ে আর কীই-বা করবেন হরিবাবু? পরিস্থিতি যা বুঝছি, এরা সব মহাকাশের জীব। আর এই যেখানে আমরা আটক রয়েছি, এটা একটা মহাকাশ-যান। আমার মনে হচ্ছে এরা আমাদের ধরে অন্য কোনও গ্রহে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে কবিতার চল আছে কি না কে জানে।"

"হরিবাবু একটু ভ্রূ কুঁচকে ভাবলেন। তারপর একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "কবিতা নেই এমন গ্রহ কোথাও থাকতে পারে না। দুনিয়াটাই তো কবিতায় ভরা, আমি তো রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাই, নক্ষত্র থেকে টপটপ করে কবিতা ঝরে পড়ছে জলের ফোঁটার মতো।"

"বটে!" বলে যতীনবাবু আর একবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। মাথা নেড়ে বললেন, "বাস্তবিক আপনি ক্ষণজন্মা পুরুষ।"

হরিবাবু একটু হাসলেন। লোকগুলো ভয়ে সব বোবা মেরে আছে। দু'চারটে ফিসফাস শোনা যাচ্ছে মাত্র। হরিবাবু ওসব গ্রাহ্য করলেন না। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে জাহাজের সঙ্গে কী মেলানো যায় তা গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন।

আংটি যখন রামরাহার পিছু-পিছু জলার ধারে এসে দাঁড়াল তখন জলার মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে। কী ঘটছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু খুব শক্তিশালী একটা যন্ত্রের চাপা শব্দ আসছিল। পায়ের তলায় মাটি সেই যন্ত্রের বেগে থিরথির করে কাঁপছে।

রামরাহা বললেন, "ওরা মাটি ফুটো করে ভিতরে চার্জ নামিয়ে দিচ্ছে।"

"চার্জ মানে?"

"এক ধরনের মৃদু বিস্ফোরক। শুধু এখানেই নয়, পৃথিবীর আরও কয়েকটা জায়গায় এরকম কাজ চলছে। চার্জগুলো কার্যকর হলেই পৃথিবী তার কক্ষপথ থেকে ধীরে ধীরে সরে সৌরমণ্ডলের বাইরের দিকে ছুটতে শুরু করবে।"

"কী ভয়ংকর!"

রামরাহা দাঁতে ঠোঁট কামড়ালেন। তাঁর পিঠে একটা রুকস্যাকের মতো ব্যাগ। সেটা ঘাসের ওপর নামিয়ে প্রথমে একটা ক্যালকুলেটারের মতো যন্ত্র বের করে কী যেন দেখতে লাগলেন।

হঠাৎ চমকে উঠে বললেন, "এ কী।"

"কী হয়েছে?"

"সর্বনাশ! আমি যে শক্তির উৎসটার কথা তোমাকে বলছিলাম, এখন দেখছি সেটার সন্ধান বর্বররাই পেয়ে গেছে। এই দ্যাখো।"

মহারাজ ওরফে রামরাহা ক্যালকুলেটরটা আংটির সামনে ধরলেন। আংটি দেখল একটা ছোট্ট ঘষা কাচের পর্দায় একটা মৃদু আলোর রেখায় ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

রামরাহা বললেন, "তোমার দাদু একজন আবিষ্কারক ছিলেন। সম্ভবত কোনও সময়ে তিনি এই অদ্ভুত জিনিসটি আবিষ্কার করেছিলেন। এই জিনিসটির সন্ধানেই বোধহয় বর্বররা এখানে হানা দিয়েছিল। খন দেখছি, ওরা ওটা পেয়ে গেছে।"

"তা হলে কী হবে?"

রামরাহা কব্জির ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, "আংটি, আমার আর বিশেষ কিছু করার নেই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পৃথিবী কক্ষচ্যুত হবে। সেই সময়ে আমার পক্ষে এই গ্রহে থাকা ঠিক হবে না। আমি সমুদ্রের তলায় আমার মহাকাশযানে ফিরে যাচ্ছি। পৃথিবীকে ওরা টেনে নেওয়ার আগেই আমাকে চলে যেতে হবে। তবে আমি তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি।"

একত্রিশ

রামরাহা আংটির পিঠে তার সবল হাতখানা রেখে বলল, "তোমাদের তেমন যন্ত্রপাতি বা অস্ত্রশস্ত্র নেই বটে, কিন্তু দারুণ সাহস আছে। তোমাদের মতো আমাদের মা, বাবা, ভাইবোন নেই, কাকা মামার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের গ্রহমণ্ডলে ওসব সম্পর্কই নেই। জন্মের পর থেকেই আমরা স্বাধীন। তাই কারও জন্য কোনও পরোয়াও নেই। যাদের জন্য তুমি নিজে মরতে চাইছ, আমি হলে তাদের জন্য এক সেকেণ্ডও চিন্তা করতাম না। সন্দেহ নেই তোমরা খুব সেকেলে, খুব আদিমযুগে পড়ে আছ এখনও। তবু এইজন্যই তোমাদের ভাল লাগে আমার।"

আংটি ছলোছলো চোখে বলল, "মা, বাবা, দাদা, কাকাদের ভীষণ ভালবাসি যে।"

রামরাহা মাথা নেড়ে বলল, "আমরা ভালবাসা কাকে বলে জানিই না। আমরা শুধু কাজ করতে জানি, যুদ্ধ করতে জানি, ফসল ফলাতে জানি, যন্ত্র-বিদ্যা জানি। আমাদের সঙ্গে যন্ত্রের খুব একটা তফাত যে নেই, তা এই পৃথিবীতে এবং বিশেষ করে তোমাদের এই পুবদিকের দেশে এসে বুঝেছি। তোমাদের কাছে এসে মনে হচ্ছে আমরা কী বিশ্রী জীবনই না যাপন করি।" বলতে বলতে রামরাহা একটা দূরবীনের মতো জিনিস চোখে এঁটে জলার দিকে তাকালেন। তারপর সামান্য উত্তেজিত গলায় বললেন, "আরে ওরা যে একটা লোককে ওদের যানে তুলে নিয়েছে!"

আংটি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে রামরাহার হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে চোখে লাগাল। এবং বায়োস্কোপের ছবির মতো দেখতে পেল, একটা বিকট দানব জলা থেকে একজন মানুষকে ধরে নিয়ে ভিতরে চলে যাচ্ছে। সবচেয়ে ভয়ংকর কথা, মানুষটা তার বাবা।

আংটি কোনও আর্তনাদ করল না। যন্ত্রটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে হরিণের মতো টগবগে পায়ে জলার জলে নেমে ছুটতে লাগল। রাগে আর আতঙ্কে সে দিশেহারা। বুদ্ধি স্থির নেই।

বিশাল পটলের মতো মহাকাশযানটার কাছাকাছি পৌঁছতেই পথ আটকাল তার চেয়ে দশগুণ বড় দশাসই একটা দানব। আংটি বিন্দুমাত্র না ভেবে লাফিয়ে গিয়ে জোড়া পায়ে দানবটার পেটে লাথি কষাল, তারপর এলোপাথাড়ি কিল চড় ঘুসি ক্যারাটের মার—কিছুই বাদ রাখল না।

আশ্চর্যের বিষয় তার মতো খুদে মানুষের ওই তীব্র আক্রমণে দানবটা আধ মিনিট যেন হতভম্ব হয়ে গেল। একবার গোঙানির মতো যন্ত্রণার শব্দও করল একটা। কিন্তু সেটা আর কতক্ষণ? আংটির লড়াই করার ক্ষমতা আর কতটুকুই বা। দানবটা তার বিশাল হাতে আংটির ঘাড়টা ধরে শূন্যে ভাসিয়ে নিয়ে ঠিক তার বাবার মতোই মহাকাশযানের ভিতরে চৌকো ঘরটায় ফেলে দিল। আংটির তেমন লাগল না। লাফঝাঁপে তার অভ্যাস আছে। সে ঘরের চারদিকে তার বাবাকে খুঁজতে লাগল।

"বাবা!"

হরিবাবু খুবই অবাক হয়ে গেলেন আংটিকে দেখে। তারপর হাত বাড়িয়ে ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "তুই কোত্থেকে এলি?"

"বাবা! আমাদের ভীষণ বিপদ।"

হরিবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "সে তো বুঝতেই পারছি। যখন জাহাজের সঙ্গে মিল দেওয়ার মতো একটাও শব্দ খুঁজে পেলাম না, তখনই বুঝলাম আমাদের খুব বিপদ ঘটেছে নিশ্চয়ই, তা আর কী করা যাবে, তোদের দুই ভাইয়ের জন্য একটা ক্রিকেট বল রেখেছি। এই নে। বাবার ল্যাবরেটরিতে

পেলাম। ভাবলাম তোরা খুব খেলা-টেলা ভালবাসিস, তোদের কাজে লাগবে হয়তো।"

আংটি গোল বস্তুটা হাতে নিয়ে বলল, "কিন্তু বাবা, এ তো ক্রিকেট-বল নয়।"

"তবে এটা কী?"

জিনিসটা হাতে তুলে নিয়ে দেখল আংটি। বেশ ভারী কোনও ধাতু দিয়ে তৈরি। গায়ে খুদে-খুদে বোতামের মতো কী সব রয়েছে। আংটির বুকটা গুড়গুড় করে উঠল। রামরাহা যে জিনিসটার কথা বলেছে, এটা সেটা নয় তো! দাদুর ল্যাবরেটরিতে যখন পাওয়া গেছে, তখন সেটাই হতে পারে। কিন্তু এই বস্তু দিয়ে কী করা যায় তা তো আংটি জানে না। সে জিনিসটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল। দেখতে-দেখতে হঠাৎ চোখ পড়ল একটা বোতামের ওপর।

আংটি বোতামটায় হালকা আঙুলে একটু চাপ দিল। কিছুই ঘটল না। আংটি আর একটু জোরে চাপ দিল। কিছুই ঘটল না এবারও।

আংটি একটু ভেবে নিল। তারপর তার শরীরের সমস্ত শক্তি আঙুলে জড়ো করে প্রাণপণে বোতামটা চেপে ধরল।

*   *   *

ঘড়ি আর পঞ্চানন্দ সবই দেখছিল। তবে আবছাভাবে।

ঘড়ি মুখ চুন করে বলল, "ওরা বাবাকে ধরেছে, আংটিকেও ধরল, এবার কী করা যায় বলুন তো!"

পঞ্চানন্দ ভয়-খাওয়া মুখে বলল, 'আমার মাথায় কিছু খেলছে না। তবে আংটি বড্ড বোকার মতো তেড়েফুঁড়ে গিয়ে বিপাকে পড়ে গেল। একটু বুদ্ধি খাটালে কাজ দিত।"

ঘড়ি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "কিন্তু বুদ্ধি তো মাথায় খেলছে না।',

পঞ্চানন্দও ঘড়ির দেখাদেখি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "আমার মাথাটা পেটের সঙ্গে বাঁধা। পেট ফাঁকা থাকলে মাথাটাও ফাঁকা হয়ে যায়। আর পেট ভরা থাকলে মাথাটাও নানারকম বুদ্ধি আর ফন্দিফিকিরে ভরে ওঠে। অনেকক্ষণ কিছু খাইনি তো।"

পঞ্চানন্দ কথাটা ভাল করে শেষ করার আগেই তার ঘাড়ে ফঁত করে একটা শ্বাস এসে পড়ল। শ্বাস তো নয়, যেন ঘূর্ণিঝড়। পঞ্চানন্দ একটু শিউরে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে যা দেখল তাতে তার বাক্য সরল না। সে হাঁ হয়ে রইল।

ঘড়ি নিবিষ্টমনে জলার মধ্যে দানবদের চলাফেরা লক্ষ্য করছিল। এক্ষুনি একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু এই প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্বল মানুষের কীই বা করার আছে! আচমকা সেও পিছন দিকে একটা কিছুর অস্তিত্ব টের পেল। বিদ্যুৎবেগে ঘাড় ঘুরিয়ে সেও যা দেখল তাতে আঁতকে ওঠারই কথা।

পিছনে বিকট এক চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গজ-পালোয়ান। দুখানা

চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। ফুলে-ওঠা শরীরটা যেন খুনখারাপির জন্য উদ্যত হয়ে আছে। হাতের আঙুলগুলো আঁকশির মতো বাঁকা।

ঘড়ি ঘুসি তুলেছিল, কিন্তু সেটা চালাল না। চাপা স্বরে বলল, "গজদা!"

গজ তার দিকে তাকাল। তারপর একটু ভাঙা-গলায় বলল, "তোরা এখানে কী করছিস?"

গজ যে মাতৃভাষায় স্বাভাবিকভাবে কথা বলবে, এটা ঘড়ি আশা করেনি। সে মনে মনে ধরে নিয়েছিল, গজ-পালোয়ানও ওই বর্বর দানবদের একজন হয়ে গেছে। কিন্তু তা হয়নি দেখে সে স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে বলল, "ওই দ্যাখো গজদা, জলার মধ্যে কী সব কাণ্ড হচ্ছে!"

গজ গম্ভীর মুখে বলল, "দেখেছি, আমাকে ওরাই আটকে রেখেছিল এই গুহায়।"

ঘড়ি আকুল হয়ে বলল, "এখন আমরা কী করব গজদা?"

"তোদের কিছু করতে হবে না। আমিই যা করার করছি।"

এই বলে গজ-পালোয়ান নিঃশব্দে জলে নেমে গেল। ওই বিশাল দেহ নিয়ে যে কেউ এত সাবলীল চলাফেরা করতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

ঘড়িও টপ করে উঠে পড়ল। কিছু একটা করতে হবে। নইলে সাংঘাতিক একটা বিপদ ঘটবে। আর একটা কিছু করার এই সুযোগ। সে গজর পিছনে পিছনে এগোতে গিয়ে টের পেল, পঞ্চানন্দও জলে নেমে পড়েছে।

গজর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অবশ্য তারা পেরে উঠছিল না। গজ এগিয়ে যাচ্ছে মোটর-লঞ্চের মতো তীব্রবেগে। ঘড়ি আর পঞ্চানন্দ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জল ভেঙে এগোতে লাগল।

* * *

রামরাহা আংটির আকস্মিক প্রস্থানে একটু থমকে গিয়েছিল। তারপর সে আপনমনে একটু হাসল। স্মিত হাসি। যে জগৎ থেকে সে এসেছে সেখানে কেউ আবেগ বা ভালবাসা দিয়ে চালিত হয় না। তারা চলে হিসেব কষে। প্রতি পদক্ষেপই তাদের মাপা। কিন্তু এই পুরনো আমলের গ্রহটিতে মানুষজনের আচার-ব্যবহার সে যত দেখছে তত ভাল লাগছে। তত এরা আকর্ষণ করছে তাকে।

রামরাহা নিজের মহাকাশযানে ফিরে যাবে বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু এখন তার মনে হল, পৃথিবীর অসহায় এইসব মানুষজনকে বাঁচানোর একটা শেষ চেষ্টা করলে মন্দ হয় না।

রামরাহা ঘাড় ঘুরিয়ে অন্ধকারের দিকে চেয়ে চাপা গলায় বলল, "মাথুস, আমার বি মিটারটা নিয়ে এসো।"

সেই সুড়ুঙ্গে লম্বা লোকটা অন্ধকার ফুঁড়ে এগিয়ে এল। হাতে একটা খুব ছোট্ট থার্মোমিটারের মতো জিনিস।

রামরাহা কোমর থেকে বেল্টটা খুলে তার একটা সকেটে মিটারটা ঢুকিয়ে

দিল। তারপর বেল্টটা কোমরে পরে নিয়ে সে জলের দিকে পা বাড়াল।

আশ্চর্যের বিষয় জলের দু'ইঞ্চি ওপরে যেন একটা অদৃশ্য কুশনে তার পা পড়ল। তারপর অনায়াসে জলের ওপর দিয়ে সে হাঁটতে লাগল।

হাতের মিটারটার দিকে বারবার চাইছিল রামরাহা। নানারকম আলোর সংকেত ভেসে উঠছে। একটা আলোর রেখা বারবার ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

আচমকা আলোর রেখাটা একটা পাক খেয়ে বৃত্ত রচনা করল।

রামরাহা থমকে দাঁড়াল! এরকম হওয়ার কথা নয়। অজানা এক শক্তির উৎস কেউ ব্যবহার করছে। যদি যন্ত্রটা সক্রিয় হয়ে ওঠে, তবে পৃথিবীর সর্বত্র সবরকম শক্তির উৎস কিছুক্ষণের জন্য অকেজো হয়ে যাবে। বিজলি উৎপন্ন হবে না। পারমাণবিক সংঘাত একরত্তি তাপ দেবে না. থেমে যাবে বেশিরভাগ রি অ্যাকটর।

রামরাহা ভাবতে লাগল, বর্বররা যদি যন্ত্রটার সন্ধান পেয়েই থাকে তবে তারা এত বোকা নয় যে, এই মোক্ষম সময়ে সেটা ব্যবহার করবে।

তবে? তা হলে?

যন্ত্রটা কে ব্যবহার করছে?

বত্রিশ

দানবের মতো লোকগুলো তাদের দ্রুত ও অতিশয় শক্তিশালী খনক দিয়ে মাটির নীচে যে-সব গর্ত করে ফেলল, সেগুলো বহু মাইল গভীর। খনকগুলোর সঙ্গেই লাগানো রয়েছে চার্জ। বহু দূর থেকে বেতার-তরঙ্গের সংকেতে সেগুলোকে সক্রিয় করা যায়। বিপুল এক উথাল-পাথাল শক্তিতে আলোড়িত হয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরে উথলে উঠবে। তারপর ভারসাম্য নষ্ট করে কক্ষচ্যুত টালমাটাল করে দেওয়া হবে পৃথিবীকে। সূর্যের বিপুল আকর্ষণ থেকে তার কোনও গ্রহকেই বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়া সহজ নয়। মানুষের বিজ্ঞানে তা একরকম অসম্ভব। কিন্তু পৃথিবী নিজেই যদি মহাকাশযানে পরিণত হয়ে ছুটতে থাকে, তবে তাও সম্ভব। দানবেরা পৃথিবীর গভীরে চার্জ ঢুকিয়ে সেই ব্যবস্থাই করে রাখল। পৃথিবী যখন ছুটতে থাকবে সৌরলোকের বাইরে, তখন এক অদৃশ্য রশ্মি দিয়ে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে তাকে। কক্ষচ্যুত হলে প্রথম ধাক্কাতেই সমুদ্রে উঠবে বিপুল জলোচ্ছ্বাস, দেখা দেবে প্রবলতম ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত। জীবজগৎ একরকম শেষ হয়ে যাবে তখনই। সৌর-লোকের বাইরে পৌঁছলে উবে যাবে পৃথিবীর আবহমন্ডল, কঠিন বরফের মৃত্যুহিম মোড়কে ঢেকে যাবে চরাচর। গ্রহটি পরে ফের নিজেদের বাসযোগ্য করে নেবে দানবেরা। তবে তখন আর সেটা এই পৃথিবী থাকবে না; এইসব গাছপালা. পাখি, জীবজন্তু, মানুষ, কিছুই না।

রামরাহা হাতের মিটারটার দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। ছোট্ট কিন্তু বিপুল শক্তির আধার একটি রহস্যময় যন্ত্র এই অদ্ভুত কাণ্ডটি

ঘটাচ্ছে। কিংবা যন্ত্রটাকে বলা যায় প্রতিশক্তির আধার। কাছাকাছি যত শক্তির উৎস আছে যন্ত্রটা ঠিক তার বিপরীত ধর্মে কাজ করে যায়। শক্তি ও প্রতিশক্তির সংঘাতে সৃষ্টি হয় একটা নিউট্রাল শূন্যতা। এরকম যন্ত্র রামরাহার অগ্রজ বিজ্ঞানীও আবিষ্কার করতে পারেনি। এই পুরনো আমলের গ্রহে একজন মানুষ কী করে বানাল এরকম জিনিস? তার চেয়েও বড় কথা, এ-যন্ত্র ব্যবহার করাও বড় সহজ নয়। বোধহয় কেউ সত্যিই সেটাকে কাজে লাগাচ্ছে। হয়তো আনাড়ির মতো। কিন্তু ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে যন্ত্রটা অনেক অসম্ভব সম্ভব করবে।

রামরাহার অত্যন্ত হিসেবি মন জীবনে এই প্রথম একটু দ্বিধাগ্রস্ত হল। ইচ্ছে করলে সে এখনই বিপন্ন পৃথিবী থেকে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যেতে পারে। পৃথিবীর এক মহাসাগরের তলায় তার মহাকাশযান তৈরি আছে। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যেই সেখানে পৌঁছে মহাকাশযানে করে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছেড়ে মহাকাশে পাড়ি দেওয়া সহজ। আর যদি পৃথিবীকে বাঁচাতে চেষ্টা করে, তবে সেই কাজে বিপন্ন হবে তার প্রাণ। শেষ অবধি হয়তো পৃথিবীও বাঁচবে না, সেও নয়। তবে সে যদি ওই যন্ত্রটা হাতে পায়, তা হলে কোনও কথাই নেই।

রামরাহার দ্বিধাটা রইল কয়েক সেকেন্ড। তারপর সে স্থির মস্তিষ্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। তাকে একটা কাজই করতে হবে। ওই ছোট্ট ছেলেটিকে তার প্রিয়জন সহ কিছুতেই সে মরতে দেবে না। সুতরাং রামরাহাকে ওই দানবদের আকাশযানে উঠতে হবে। দানবদের হাতে ধরা দিতে হবে।

"জানুস!"

সেই লম্বা লোকটা অবিকল রামরাহার মতোই জলের ওপর দিয়ে ভেসে এগিয়ে এল। রামরাহা তার সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি গা থেকে খুলে লোকটার হাতে দিয়ে বলল, "সেন্টারে গিয়ে অপেক্ষা করো।"

যন্ত্র না থাকায় রামরাহাকে জলে নামতে হল। সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই থাকলেও লাভ ছিল না। দানবদের ট্রেসারে তা ধরা পড়ত, এবং ওরা তা কেড়ে নিত।

রামরাহা খুব বোকা মানুষের মতো এগিয়ে গেল।

একজন দানব তাকে দেখে ক্রুদ্ধ এক শব্দ করল। বাকিরা বিদ্যুত-গতিতে ধেয়ে এল তার দিকে।

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে রামরাহার পক্ষে এই আক্রমণ ঠেকানো মোটেই শক্ত কাজ ছিল না। কিন্তু এখন সে একটুও গায়ের জোর দেখাবে না, শুধু সামান্য একটু বাধা দেবে। নইলে ওরা সন্দেহ করতে পারে।

প্রথম যে দানবটা তার দিকে তেড়ে এল, তাকে এড়াতে রামরাহা একটু দৌড়ে পালানোর ভান করল। লোকটা লম্বা হাত বাড়িয়ে খামচে ধরল তার কাঁধ। আর একজন তার দু' পা ধরে সটান শূন্যে তুলে ফেলল। তারপর

একটা আছাড়।

রামরাহা হাসছিল। দশতলা বাড়ি থেকে সে তো কতদিন স্রেফ লাফ দিয়ে নেমেছে। তবু সে একটু যন্ত্রণার শব্দ করল। তিন-চারজন দানব এসে চ্যাংদোলা করে তুলে নিল তাকে। এরা একটা অদ্ভুত ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

রামরাহা চুপ করে কথাগুলো শুনতে লাগল। তার সঙ্গে অনুবাদযন্ত্র নেই। কিন্তু বিপুল বিশ্বের অনেক গ্রহে সে ঘুরেছে, ভাষাও শুনেছে হাজার রকম। শব্দ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা বিপুল। তাই সে শব্দ ধরে-ধরে অর্থে পৌঁছনোর চেষ্টা করতে লাগল মনে-মনে। তার মাথা টেপরেকর্ডারের মতোই নির্ভুল স্মৃতিশক্তির অধিকারী। যা শোনে বা দ্যাখে, সব হুবহু মনে থাকে।

খানিকক্ষণ শুনে রামরাহা বুঝতে পারল, এরা পৃথিবী থেকে কিছু মানুষকে জ্যান্ত অবস্থায় নিজেদের গ্রহে নিয়ে যাচ্ছে নমুনা হিসেবে। এইসব মানুষের হৃৎপিণ্ড, রক্ত, ফুসফুস সব তারা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করবে। দেখবে এদের বেঁচে থাকার পদ্ধতি। এর জন্য কয়েকজন মানুষকে মেরে ফেলতে হবে। বাকিদের জিইয়ে রেখে দেওয়া হবে চিড়িয়াখানার জন্তু হিসেবে।

চ্যাংদোলা করে এনে যে-ঘরটায় দানবেরা তাকে ফেলে দিল, সেটাতে রামরাহা বেশ কয়েকজন মানুষকে দেখতে পেল। যাকে দেখে সে সবচেয়ে খুশি হল, সে আংটি।

আংটি তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "রামরাহা!"

রামরাহা হাত বাড়িয়ে বলল, 'যন্ত্রটা দাও।"

"যন্ত্র!" বলেই কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল আংটি। তারপর মাথা নেড়ে বলল, "নেই। কেড়ে নিয়ে গেছে।"

"কী করে কাড়ল?"

"আমি যন্ত্রটায় একটা রঙিন বোতাম দেখে চাপ দিয়েছিলাম। খুব জোরে। তাতে কিছু হয়নি। কিন্তু হঠাৎ একটা দানব এসে হাজির। আমাকে একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে যন্ত্রটা কেড়ে নিয়ে গেল এই একটু আগে।"

রামরাহা ঠোঁট কামড়াল।

"কী হবে রামরাহা?"

"দেখা যাক। কাজটা আর সহজ রইল না, এই যা।"

হঠাৎ একজন লোক এগিয়ে এসে রামরাহার মুখের দিকে চেয়ে করুণ স্বরে বলল, "আচ্ছা মশাই, জাহাজের সঙ্গে মেলানো যায়, এমন একটা শব্দ বলতে পারেন?"

রামরাহা অবাক হয়ে বলল, "জাহাজ!"

আংটি বলল, "ইনি আমার বাবা। আমার বাবা একজন কবি।"

"কবি! কবি কাকে বলে?"

"যারা কবিতা লেখে।"

রামরাহা মাথা চুলকে বলল, "কবিতা! কিন্তু আমাদের দেশে তো এরকম কোনও জিনিস নেই। কবিতা! কবিতা! কীরকম জিনিস বলো তো!"

হরিবাবু খুব দুঃখের সঙ্গে বললেন, "তা হলে আপনার দেশেরই দুর্ভাগ্য রাহাবাবু। বাঙালি হয়ে কবিতা কাকে বলে জিজ্ঞেস করছেন! আপনার লজ্জা হওয়া উচিত।"

যে-সময়ে এই নাটক ভিতরে চলছিল, ঠিক সেই সময়ে গজ-পালোয়ান তার অতিকায় চেহারাটা নিয়ে শ্বাপদের মতো এসে পৌঁছল মহাকাশযানের কাছে। একজন দানব মাত্র পাহারায়। বাকিরা রামরাহাকে ভিতরে নিয়ে গেছে, এখনও ফেরেনি।

গজ-পালোয়ান একবার চারদিকটা দেখে নিয়ে নিঃশব্দে কয়েক পা এগিয়ে দানবটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল।

দানবটা চকিত পায়ে একটু সরে গিয়েছিল শেষ মুহূর্তে নিজের বিপদ টের পেয়ে। তবে গজকে সম্পূর্ণ এড়াতে পারেনি সে। গজ'র কাঁধের ধাক্কায় সে ছিটকে গেল খানিকটা। তারপর উঠে এসে গজকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল।

কিন্তু পারবে কেন! গজ'র শক্তি এবং মত্ততা দুই-ই দশ-বিশ গুণ বেড়েছে। উপরন্তু সে তার প্যাঁচ-পয়জারও ভোলেনি। সে দু'হাতে বিপুল দু'খানা ঘুষি চালাল দানবটার মুখে। দানবটা টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। গজ তার পা দু'খানা ধরে পেল্লায় দুটো পাক মারল মাথার ওপর তুলে। তারপর একটি আছাড়।

কিন্তু আছাড় মারতে গিয়েই দানবটার কোঁচড় থেকে কী একটা ভারী আর শক্ত জিনিস ঠক্ করে গজ'র মাথায় পড়ল।

"উঃ," বলে বসে পড়ল গজ।

দানবটা উপুড় হয়ে পড়ে রইল। নড়ল না।

ঘড়ি আর পঞ্চানন্দ এসে গজকে ধরল।

"তোমার কী হল গজদা! দানোটাকে তো আউট করে দিয়েছ।

পঞ্চানন্দ হাতের টর্চটা জ্বেলে গজ'র মাথাটা দেখে বলল, "এঃ, খুব লেগেছে এখানটায়। কালসিটে দেখা যাচ্ছে।...আরে, ওটা কী?" এই বলে পঞ্চানন্দ মাটি থেকে একটা গোলাকার বস্তু তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

ঘড়ি হাত বাড়িয়ে বলল, "দেখি।"

পঞ্চানন্দ হঠাৎ "বাপ্ রে" বলে আঁতকে উঠে চেঁচাল, "দৌড়ও! আসছে!"

কিন্তু সামান্য বে-খেয়ালে যে-ভুল তারা করে ফেলেছিল, তা আর শোধরানো গেল না। চার-পাঁচজন দানো চোখের পলকে ঘিরে ফেলল তাদের।

শেষ চেষ্টা হিসেবে হাতের ভারী বলের মতো বস্তুটা পঞ্চানন্দ প্রাণপণে ছুঁড়ে মারল একজন দানোর মাথা লক্ষ্য করে। কিন্তু দানোটা স্লিপের দক্ষ ফিল্ডারের মতো সেটা লুফে নিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা একে-একে নিক্ষিপ্ত হল দানোদের মহাকাশ-

যানের গুপ্ত ঘরে। আংটি চেঁচিয়ে উঠল, "দাদা!"

বড় ছেলে ঘাড়িকে দেখে হরিবাবু খুশি হলেন। তবে পঞ্চানন্দকে দেখে তাঁর প্রাণে যেন জল এল। হরিবাবু ভারী খুশি হয়ে বললেন, "পঞ্চানন্দ যে!"

"আজ্ঞে, আমিই। যেই শুনলুম আপনাকে এই গাধাগুলো ধরে এনেছে, অমনি আর থাকতে পারলুম না, ছুটে এলুম। তা ভাল তো কর্তাবাবু?"

"ভাল আর কী করে থাকব বলো। জাহাজের সঙ্গে মিল দিয়ে একটা শব্দও যে মাথায় আসছে না। নাগাড়ে ঘণ্টা-দুই ধরে ভাবছি।"

পঞ্চানন্দ একগাল হেসে বলল, "জাহাজ যখন পেয়েছেন, তখন মিলটা আর এমন কী শক্ত জিনিস। হয়ে যাবে'খন।"

"আচ্ছা, মমতাজ শব্দটা কি চলবে হে পঞ্চানন্দ?"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলল, "চলবে, খুব চলবে।"

"কিন্তু একটা অক্ষর যে বেশি হয়ে যাচ্ছে হে।"

"তা হোক। অধিকন্তু ন দোষায়।"

"না হে না, কবিতায় অধিকন্তু চলে না, ন্যূনও চলে না। দেখি আর-একটু ভেবে। সময়টাও কাটাতে হবে।

এসব কথা যখন চলছে, তখন হঠাৎই একটা শিহরণ টের পেল সবাই। তারপর তীব্র একটা বাতাস কাটার শব্দ। একটা ভারহীনতার অনুভূতি।

সবাই কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বাক্যহারা হয়ে গেল।

রামরাহা আংটির কানে-কানে বলল, "আমরা পৃথিবী ছেড়ে চলেছি।"

আতঙ্কিত আংটি বলল, "কোথায়?"

"মহাকাশে।"

আংটি বোবা হয়ে গেল।

যে গর্ত দিয়ে তাদের ঘরের মধ্যে ফেলা হয়েছে, সেটার দিকে চোখ রেখেছিল রামরাহা। গর্তটার কোনও পাল্লা বা ঢাকনা নেই। একজন দানব ওপরে দাঁড়িয়ে তাদের নজরে রাখছে। তার হাতে একটা খুদে যন্ত্র, অনেকটা ইনজেকশনের সিরিঞ্জের মতো। যন্ত্রটা চেনে রামরাহা। ছুঁচের মুখ দিয়ে তরলের পরিবর্তে একটা আলোর রেখা বেরিয়ে আসে। যাকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয়, সে কয়েক ঘণ্টার জন্য ঘুমিয়ে পড়ে।

রামরাহা আংটিকে বলল, 'শোনো আংটি, এখান থেকে গর্তটার মুখ দশ ফুটের বেশি উঁচু হবে না। আমার পক্ষে এই দশ ফুট লাফিয়ে ওঠা খুব শক্ত কাজ নয়। এমনকী, ওই দানবটাকে কব্জা করাও কঠিন হবে না। কিন্তু তারপরেই গণ্ডগোল দেখা দেবে। আমরা সবাই মিলে লড়াই করে ওদের হারিয়ে দিলেও পৃথিবী বাঁচবে না। কারণ ওরা একা নয়। পৃথিবীর আরও কয়েক জায়গা থেকে ঠিক এই সময়ে একই রকম মহাকাশযানে আরও কতগুলো দানব মহাকাশে উড়ে যাচ্ছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ওরা দূর-নিয়ন্ত্রণে পৃথিবীকে ভারসাম্যহীন করে দেবে। তারপর চার্জগুলো চালু করবে। যা করবার করতে

হবে এক ঘণ্টার মধ্যেই।"

'কী করব রামরাহা ?"

"আমার ওই গোলকটা চাই। ওটা হাতে পেলে সবই সম্ভব। নইলে ..."

"নইলে কী হবে সে তো জানি।"

"তা হলে তৈরী হও। আমি যখন লাফ মারব, তখন তুমি আমার কোমর ধরে ঝুলে থাকবে। খুব শক্ত করে ধরবে। পড়ে যেও না। আমি উপরে উঠেই দানবটার সঙ্গে লড়াই করব। সেই ফাঁকে তুমি সরে পড়বে। যেমন করেই হোক, গোলকটা তোমাকে উদ্ধার করতে হবে। আমাদের বাঁচার এবং পৃথিবীকে বাঁচানোর ওইটেই একমাত্র এবং শেষ অবলম্বন। পারবে ?"

আংটি দাঁতে ঠোঁট টিপে বলল, "এমনিতেও তো মরতেই হবে। পারব।"

"তবে এসো। গেট রেডি।"

দশ ফুট হাইজাম্প দেওয়া যে সম্ভব, এটা বিশ্বাস করাই শক্ত। বিশেষ করে একটুও না দৌড়ে শুধু দাঁড়ানো অবস্থা থেকে অতটা উঁচুতে লাফানো এক অলৌকিক ব্যাপার। আংটির বিশ্বাস হচ্ছিল না। তবু রামরাহার কোমর ধরে দাঁড়াল। মহাকাশযানটা কাঁপছে আর কেমন যেন একটা শিহরণ খেলে যাচ্ছে বাতাসে। কানে একটা অদ্ভুত শব্দ বা তরঙ্গ এসে লাগছে। মহাকাশের অভিজ্ঞতা তো নেই আংটির। তার হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। তবু সে প্রাণপণে ধরে রইল রামরাহাকে।

রামরাহা ওপরের দিকে চেয়ে একটু হিসেব কষে নিল। মহাকাশে যদিও ভারহীন অবস্থায় তারা পেঁছে গেছে,তবু এই মহাকাশযানে সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে না। কৃত্রিম উপায়ে এরা এই ঘরে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মতোই অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে। সেইটে হিসেব কষে নিয়ে রামরাহা আচমকা শূন্যে একটা রকেটের মতো মসৃণ লাফ দিল। আংটির মনে হল, সে যেন লিফটে করে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

চমৎকার লাফ। গর্তটার ভিতর দিয়ে সোজা উঠে দু'পাশে ছড়ানো পায়ে দাঁড়িয়েই দানবটাকে রামরাহা দুই হাতে ধরেই শূন্যে তুলে ফেলল। তারপর চাপা গলায় বলল, "আংটি, পালাও। কাজ সেরে আসা চাই।"

তেত্রিশ

কোনু দিকে যেতে হবে, কোথায় খুঁজতে হবে, তার কিছুই জানে না আংটি। তবু অন্ধের মতো সে ছুটতে চেষ্টা করল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, রামরাহা দৈত্যটাকে স্রেফ দু'হাতে ধরে ওয়েটলিফটার যেমন মাথার ওপর ভার তুলে দাঁড়ায় তেমনি তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দৈত্যটা অসহায়ের মতো হাত-পা ছুঁড়ছে।

দানবদের মহাকাশযান তাদের আকারেই তৈরী। মস্ত মই, মস্ত বড় সব যন্ত্রপাতি, বিশাল সব কুঠুরি। তার মধ্যে মেলা অলিগলিও আছে। কোনু

দিকে যাবে তা আংটি বুঝতে পারছিল না। সামনে যে পথ বা সিঁড়ি পাচ্ছে, তাই দিয়ে এগোচ্ছে বা উঠছে। এক জায়গায় ভারী কাঁচ লাগানো গোল একটা জানালা দেখতে পেয়ে কৌতূহল চাপতে পারল না আংটি। উঁকি দিয়ে সে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। কুচকুচে কালো আকাশে এক অতিশয় উজ্জ্বল সূর্য জ্বলজ্বল করছে। একটু দূরে এক নীলাভ সবুজ বিশাল গ্রহ। গ্রহটাকে চিনতে অসুবিধে হল না আংটির। তাদের আদরের পৃথিবী। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আফ্রিকা, দক্ষিণ ভারত, এশিয়া, আরব সাগর, ঠিক যেমন মানচিত্রে দেখেছে। পৃথিবী যে কত সুন্দর তা প্রাণ ভরে আজ উপলব্ধি করল আংটি। চাঁদকে দেখতে পেল সে। আবহমণ্ডলহীন আকাশে গ্রহনক্ষত্র চৌগুণ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে। মহাকাশে যেসব শারীরিক অসুবিধে বোধ করার কথা, তার বিশেষ কিছুই টের পাচ্ছিল না আংটি। তবে মাঝে-মাঝে গা গুলোচ্ছে আর কানে তালা লাগছে।

সুন্দর পৃথিবীর দিকে চেয়ে আংটি চোখের জল মুছল। এমন সুন্দর গ্রহকে ধ্বংস হতে দেয়া যায়? রামরাহা অপেক্ষা করছে। তাকে গোলকটা উদ্ধার করতেই হবে।

আংটি সামনেই একটা লোহার মই পেয়ে উঠতে লাগল। ওপরে একটা গলি পথ। আংটি গলি ধরে খানিক দূর এগিয়ে একটা ধাতুর তৈরি বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজায় হাতল নেই, নব নেই। একেবারে লেপাপোঁছা।

আংটি দরজায় কান পেতে শোনার চেষ্টা করল।

ভিতর থেকে মৃদু সব যান্ত্রিক শব্দ আসছে। দু-একটা দুর্বোধ্য কথাবার্তা। আংটির কাছে সবটাই দুর্বোধ্য। আংটি কী করবে তা বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইল। দানবেরা যে খুবই উন্নতমানের বিজ্ঞানী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নইলে পৃথিবীর মতো বিশাল একটি গ্রহকে সূর্যের পরিমণ্ডল থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাও যে অসম্ভব! কিন্তু মস্ত বিজ্ঞানী হলেও তারা মানুষের মতো নয়। কোথাও যেন বাস্তববোধ এবং সাধারণ বুদ্ধির একটু খামতি আছে।

এতক্ষণ নিশ্চয়ই রামরাহাও চুপ করে বসে নেই। সেও একটা কিছু করছে। কিন্তু যে যাই করুক গোলকটা হাতে না পেলে সবই পণ্ডশ্রম। একটু বাদেই দানবদের মহাকাশযান থেকে পৃথিবীর অভ্যন্তরে ভয়ংকর সব চার্জ-এ বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। তারপর আলোর চেয়েও বহু-বহুগুণ গতিবেগে দানবেরা ছুটতে থাকবে তাদের নিজস্ব গ্রহমণ্ডলের দিকে।

আংটি দরজাটার গায়ে হাত বুলিয়ে দেখল। মসৃণ। খুবই মসৃণ এক ধাতু দিয়ে তৈরি। অনেকটা সোনার মত রঙ। তবে বেশি উজ্জ্বল নয়।

"এখানে কী করছিস?"

চাপা গলায় এ-কথা শুনে আংটি চমকে উঠল। অবাক হয়ে চেয়ে দেখল, তার পেছনে ঘড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

আংটি মস্ত একটা শ্বাস ফেলে বলল, "দাদা! তুই কী করে উঠে এলি?"

"গজদার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে। রামরাহা তুলে নিল।"

"রামরাহা কোথায়?"

"ধারেকাছেই কোথাও আছে। এই ঘরটার মধ্যে কী হচ্ছে?"

"বুঝতে পারছি না। তবে কথাবার্তার শব্দ শুনছি। তোর হাতে ওটা কী?"

ঘড়ি নিজের হাতের রুমালের পুঁটুলির দিকে চেয়ে বলল, "একটা কাঁকড়া-বিছে।"

"কাঁকড়াবিছে! কোথায় পেলি?"

"সে অনেক কথা। তবে এটা খুব সহজ জিনিস নয়! দেখবি?"

ঘড়ি রুমালটা মেঝেয় রেখে রুমালের গিঁট খুলে দিল। সবুজ রঙের বিছেটা ঝিম মেরে রয়েছে। একটা সুগন্ধে চারদিক ভরে যেতে লাগল। এত সুন্দর গন্ধ যে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

দুই ভাই হঠাৎ অবাক হয়ে দেখল, কাঁকড়াবিছেটা একটা ডিগবাজি খেয়ে আস্তে-আস্তে দরজাটার দিকে এগোতে লাগল। দরজার তলার দিকে সামান্য একটু ফাঁক রয়েছে। আধ সেন্টিমিটারেরও কম। বিছেটা কিন্তু ধীরে-ধীরে গিয়ে সেই ছোট্ট ফাঁকের মধ্যে নিজের শরীরটা ঢুকিয়ে দিল। তারপর সুট করে ঢুকে গেল ভিতরে। ঘড়ি ওটাকে আটকানোর চেষ্টা করল না দেখে আংটি বলল, "যেতে দিলি কেন?"

"দেখা যাক না, কী করে।"

দুই ভাই দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চারদিকটা খুব ভাল করে লক্ষ্য করল। দেখার মতো কিছুই নেই। মেঝে দেওয়াল ছাদ সবই মসৃণ ধাতুর তৈরি। ওপরে সারি-সারি পাথরের স্নিগ্ধ আলো জ্বলছে।

দরজাটা যে খুব ধীরে-ধীরে খুলে যাচ্ছে, এটা প্রথম লক্ষ্য করল আংটি। সে শিউরে ঘড়ির হাত চেপে ধরল। দরজাটা খুলছে খুব অদ্ভুতভাবে। নীচে থেকে ওপরে উঠে যাচ্ছে থিয়েটারের ড্রপস্ক্রিনের মতো।

খোলা দরজার ওপাশে মস্ত একখানা ঘর। তীব্র আলো জ্বলছে। হাজার রকমের কনসোল, যন্ত্রপাতি, শব্দ। খোলা দরজা দিয়ে টলতে টলতে একজন দানব বেরিয়ে এল। তার মুখের করুণভাব দেখেই বোঝা যায় যে, সে সুস্থ নয়। জিভ বেরিয়ে ঝুলে আছে। গলা থেকে একটা গোঙানির শব্দ আসছে।

আংটি শিউরে উঠে বলল, "দাদা!"

ঘড়ি হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "ভয় পাসনি। এটা ঐ কাঁকড়াবিছের কাজ।"

দানবটা তাদের দেখতে পেয়ে একটু থমকাল। কোমরের দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু যে জিনিসের জন্য হাত বাড়িয়েছিল তা ছোঁওয়ার আগেই ঘড়ি লাফিয়ে পড়ল তার ওপর। দুর্বল দানবটা ঘড়ির দুটো ঘুসিও সহ্য করতে পারল না। ধদাম করে পড়ে গেল মেঝের ওপর। ঘড়ি তার কোমরের বেল্ট থেকে একটা

ছোট্ট লাইটারের মতো যন্ত্র খুলে নিল।

আংটি বলল, "ওটা কী করে?"

"জানি না। তবে কাজে লাগতে পারে। আমরা না পারি, রামরাহা কাজে লাগাবে। এখন আয়, ভিতরটা দেখি। হামাগুড়ি দিয়ে আসবি কিন্তু।"

দুই ভাই হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। চারদিকে যা তারা দেখছে তার কিছুই তারা কস্মিনকালেও দ্যাখেনি। চারদিকটায় এক যান্ত্রিক বিভীষিকা। তারই ফাঁকে-ফাঁকে এক-আধজন দানবকে মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। কোনওদিকে দৃকপাত নেই।

আংটি কাঁকড়াবিছেটাকে আবিষ্কার করল একটা টেবিলের নীচে। ঝিম মেরে পড়ে আছে। সে ঘড়িকে একটা খোঁচা দিয়ে বিছেটাকে দেখাল।

ঘড়ি টপ করে বিছেটার হুলের নীচে দু'আঙুল দিয়ে ধরে সেটাকে তুলে নিল হাতের তেলোয়। তারপর চাপা গলায় বলল, "এটা মাঝে-মাঝে নেতিয়ে পড়ে কেন ভেবে পাচ্ছি না।"

বলে সে চিত করে বিছেটার বুকের কাছটা দেখল। ছোট-ছোট সব বোতামের মতো জিনিস রয়েছে। একটার রং লাল। ঘড়ি সেটা একটু চাপ দিতেই ক্লিক করে একটু শব্দ। তারপরই বিছেটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। ঘড়ি কাছাকাছি যে দানবটার পা দেখতে পাচ্ছিল, সেটার দিকে মুখ করে মেঝেয় ছেড়ে দিল বিছেটাকে। অমনি বিছেটা একটা দম-দেওয়া খেলনাগাড়ির মত বেশ দ্রুত বেগে সেই পা লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল।

যন্ত্রপাতির প্রবল শব্দের মধ্যেও দানবটার চাপা আর্তনাদ শুনতে পেল তারা। দানবটা উঠে দাঁড়াল, তারপর থরথর করে কেঁপে পড়ে গেল মেঝেয়। তারপর উঠে টলতে-টলতে দরজার দিকে রওনা হল।

ঘড়ি সময় নষ্ট করল না। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দানবটাকে টেনে মেঝেয় ফেলে তার মুখে দুখানা ঘুষি বসিয়ে দিল দ্রুত পর পর। এই দানবের কোমরে পাওয়া গেল ডটপেনের মতো একটা বস্তু। ঘড়ি সেটাও খুলে নিল।

আংটি দানবটার শরীর হাতড়ে বলল, "গোলকটা এর কাছে নেই।"

ঘড়ি কাঁকড়াবিছেটাকে আবার তুলে চালু করে ছেড়ে দিল।

একটু বাদেই আবার এক দানব একইভাবে আর্তনাদ করে উঠল।

কিন্তু এবার ঘড়ির কাজটা আর সহজ হল না। হঠাৎ অন্য তিন-চারজন দানব একসঙ্গে ফিরে তাকাল ভূপাতিত দানবটার দিকে। তারপর ছুটে এল সকলে।

প্রথমেই ধরা পড়ে গেল ঘড়ি। একজন দানব একটা থাবা মেরে তাকে তুলে নিল বেড়ালছানার মতো।

আংটি একটু আড়াল পেয়ে গিয়েছিল। তার সামনে একটা বাক্সের মতো জিনিস। বাক্সের একটা ডালাও আছে। আংটি চিন্তাভাবনা না করে ডালাটা তুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। তারপর ডালাটা আস্তে জোরে নামাল। ঘড়ির কী হল তা

সে বুঝতে পারল না।

বাক্সের মধ্যে ঘোর অন্ধকার। হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে চারদিকটা দেখল আংটি। আংটির হিসেবমতো দানবেরা ছ-সাতজনের বেশি নেই। একজনকে রামরাহা জব্দ করেছে। বাকি তিনজন বিছের কামড়ে কাহিল। খুব বেশি হলে আর দু-তিনজন দানবের মহড়া নিতে হবে। ভেবে বুকে একটু বল এল আংটির। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে খুব সন্তর্পণে ডালাটা ঠেলে তুলল।

ঘরের ছাদের কাছে ক্যাটওয়াকের মতো একটা জায়গায় একজন দানব দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখছে। আংটির সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। কিন্তু দানবটা তাকে দেখতে পেয়েছে বলে মনে হল না। বাক্সের সামনে মেঝের ওপর লাইটারের মতো জিনিসটা পড়ে আছে। ওটা দিয়ে কী হয় তা জানে না আংটি। কিন্তু মনে হল, কোনও অস্ত্রই হবে। সে যন্ত্রটার দিকে হাত বাড়াল। খুব ধীরে-ধীরে। তার চোখ ওপরে দানবটার দিকে।

শেষ মুহূর্তে একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল আংটি। যন্ত্রটা তুলতে গিয়ে একটু দ্রুত হাত বাড়িয়েছিল। সেই নড়াটুকু চোখে পড়ে গেল দানবটার। ওই ওপর থেকে দানবটা এক লাফে নীচে নামল।

আংটি যন্ত্রটা তুলে নিয়ে কিছু না বুঝেই দানবটার দিকে সেটা তাক করে ট্রিগার বা ওই-জাতীয় কিছু খুঁজতে লাগল। বুড়ো আঙুলের তলায় আল-পিনের মাথার মতো কিছু একটা অনুভব করে সেটায় প্রাণপণে চাপ দিল সে।

চিড়িক করে একটা শব্দ। বুলেট নয়, অন্য কিছু একটা জিনিস ছুটে গেল দানবটার দিকে। দানব কাটা কলাগাছের মতো লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

অন্য সব দানবেরা চিৎকার করে ছুটে এল।

আংটি বুঝল, লুকিয়ে থাকা বৃথা। সে বাক্সের ডালাটা খুলে বেরিয়ে এসে যন্ত্রটা আর-একজনের দিকে তাক করল। কিন্তু তার হাত উত্তেজনায় ভয়ে এত কাঁপছিল যে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল সে। অমনি দানবটা একটা হুংকার দিয়ে ঝাঁপ খেল তার ওপর।

দানবের শরীরের চাপে চিড়েচ্যাপ্টাই হয়ে যেত সে। কিন্তু হঠাৎ বিদ্যুতের বেগে আর-একটা লোক যেন শূন্য দিয়ে ভেসে এল। আর তার দুই লোহার হাতে দানবটাকে তুলে অন্য দিকে ছুঁড়ে দিল।

"রামরাহা!" চেঁচিয়ে উঠল আংটি।

শেষতম দানবটি দৃশ্যটা দেখে চকিতে তার বেল্ট থেকে একটা জিনিস খুলে আনল। সেটা তাক করল রামরাহার দিকে।

এবার আংটির পালা। এক বানরের লাফে সে দানবের হাত ধরে ঝুলে পড়ল। ঝুল খেয়েই দানবের হাঁটুটায় সে পেল্লায় এক কিক জমিয়ে দিল।

মনঃসংযোগে এই সামান্য ব্যাঘাতই চাইছিল রামরাহা। উড়ন্ত এক বল্লমের মতো সে দানবটার বুকে এসে পড়ল। তারপর দানবটাকে অনায়াসে দু'হাতে তুলে আছড়ে ফেলল সে।

রামরাহা সব ক'জন দানবের শরীর তল্লাশ করে বলল, "কিন্তু গোলকটা কোথায় ? সেটা না পেলে তো সব চেষ্টা বৃথা যাবে।"

আংটি আর্তনাদ করে উঠল, "নেই" ?

কোথা থেকে ক্ষীণ একটা গলা বলে উঠল, "আছে ! এখানে !"

রামরাহা দৌড়ে গেল দেয়ালের কাছে। দেয়ালে কম্বিনেশন লকের মতো গোল চাকতি আর নানা সংকেত ! রামরাহা কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে নিয়ে ডিস্কটা ঘোরাতে লাগল। একসময়ে চড়াক করে দেয়ালের গায়ে একটা কুলুঙ্গির ঢাকনা খুলে গেল। তার মধ্যে ঘড়ি। ঘড়ির হাতে গোলক। মুখে হাসি।

রামরাহা গভীর একটা শ্বাস ফেলে পরম নিশ্চিন্তে বলল, "আর ভয় নেই।"

বলাই বাহুল্য, মানুষের মস্ত এক বিপদ ঘটতে-ঘটতেও শেষ অবধি ঘটতে পারেনি। অল্পের জন্য ফাঁড়াটা কেটেছে। কিন্তু এ-গল্পের শেষ অবধি কী ঘটল সেটা জানার ইচ্ছে আমাদের হতেই পারে।

রামরাহা খুবই দক্ষতার সঙ্গে সেই গোলকটি ব্যবহার করে দানবদের পুঁতে রাখা চার্জ অকেজো করে দেয়। তার আগেই সে অবশ্য মহাকাশযানটিকে নামিয়ে এনেছিল। নইলে প্রতিশক্তি-উৎপাদক গোলকটির প্রভাবে মহাকাশযানের কলকব্জাও অকেজো হয়ে যেত এবং তারা ঝুলে থাকত মহাশূন্যে। দানবদের অন্য চারটি মহাকাশযান, যেগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে যাত্রা করেছিল সেগুলির ভাগ্যে এরকমই ঘটেছিল।

যে কয়েকজন দানব তাদের হাতে ধরা পড়েছিল তাদের দিয়ে রামরাহা মাটির তলা থেকে সমস্ত চার্জ তুলে আনে। তারপর মহাকাশযানে সেগুলি দানবদের সঙ্গেই তুলে দেওয়া হয়। দানবদের জন্য রামরাহা বা আর কেউ কোনও শাস্তির ব্যবস্থা করেনি। কারণ,তা হলে তাদের খুন করতে হয়। দানবরা অবশ্য রামরাহাকে কথা দিয়ে যায় যে, ভবিষ্যতে তারা আর পৃথিবীতে হানা দেবে না।

বিপন্মুক্ত পৃথিবীতে প্রথম শ্বাস নিয়েই আংটি পাঁচটি ডিগবাজি খেয়েছিল আনন্দে। ঘড়ি খেল ছয়টি। দেখাদেখি পঞ্চানন্দ দশটি ডিগবাজি খেয়ে ফেলল। হরিবাবুর মনে হল, ডিগবাজি খেলে মস্তিষ্কে একটা নাড়াচাড়ার ফলে জাহাজের সঙ্গে মিল খায় এমন একটা শব্দ মাথায় এসেও যেতে পারে, তিনি পনেরোটা ডিগবাজি খেয়ে গায়ের ব্যথায় সপ্তাহখানেক বিছানায় পড়ে রইলেন।

রামরাহা চক-সাহেবের বাড়িতে আরও কয়েকদিন রইল। আংটি আর ঘড়ি কিছুতেই তাকে সমুদ্রগর্ভে ফিরে যেতে দেবে না। রামরাহা তখন কথা দিল যে, সে আরও কিছুকাল পৃথিবীতে থাকবে। এই গ্রহটা তার খুবই ভাল লাগছে। মাঝে-মাঝে সে ঘড়ি আর আংটির কাছে বেড়াতে আসবে। গোলকটা রামরাহার কাছেই রইল। সে ছাড়া এর মর্ম আর কে বুঝবে ?

পঞ্চানন্দ একদিন ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে হরিবাবুকে বলল, "কর্তাবাবু, এবার তো আমাকে ছেড়ে দিতে হয়।"

হরিবাবু আঁতকে উঠে বললেন, "বলো কী হে, তোমাকে ছাড়লে আমার চলবে কেন?"

"আজ্ঞে, আমি লোক বিশেষ সুবিধের নই। আগেই বলেছিলুম আপনাকে। আমি হলুম গে আসলে গোয়েন্দা।"

হরিবাবু ফের চমকে উঠলেন, "গোয়েন্দা, সর্বনাশ!"

"ঘাবড়াবেন না। গোয়েন্দা শুনলে লোকে ভয় খায় বটে, কিন্তু ভাল লোকদের ভয়ের কিছু নেই। অনেকদিন ধরেই সরকার-বাহাদুর এ-জায়গায় একটা গণ্ডগোলের আঁচ পাচ্ছিলেন। তাই আমাকে পাঠানো হয়েছিল।"

সুতরাং পঞ্চানন্দকেও বিদায় দেওয়া হল।

রয়ে গেল গজ-পালোয়ান। ধীরে-ধীরে তার শরীর শুকিয়ে আবার আগের মতো হয়ে গেল। অবশ্য পঞ্চানন্দ তার সম্পর্কে সব কথাই জানত। একদল খারাপ লোক তাকে লাগিয়েছিল গোলকটা চুরি করতে। গজ-পালোয়ানের অতীত ইতিহাসও খুব ভাল নয়। কিন্তু সে দানবের সঙ্গে প্রাণ তুচ্ছ করে লড়াই করেছিল বলে শেষ অবধি তার সম্পর্কেও লোকের রাগ রইল না। গজ ফের কুস্তি শেখাতে শুরু করল।

কিন্তু মুশকিল হল, হরিবাবু জাহাজের সঙ্গে মেলানো শব্দটা খুঁজে পাচ্ছেন। রোজ দিস্তা-দিস্তা কাগজ নষ্ট হচ্ছে।

———